বিচিত্র মণিপুর

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—প্রকাশক—
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

মণিপুরী নৃত্যের অন্তর্নিহিত রস-সম্পদ যে ছন্দরসিক কবির দৃষ্টির
সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম পরিপূর্ণ মহিমায় উদ্ঘাটিত হয়েছিল,
মণিপুররাজ-দুহিতা চিত্রাঙ্গদা এবং আর্য্য-পুত্র
অর্জ্জুনের প্রণয়কাহিনীর নাট্য-রূপায়ণ
যাঁর সৃজনী প্রতিভার অমর অবদান;
বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ও মণিপুরের
সংস্কৃতিগত মিলনের অগ্রদূত
সেই লোকোত্তর মনীষী,
কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথের

বরণীয় স্মৃতির উদ্দেশে বঙ্গ-মণিপুর
মিলন-প্রয়াসী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ

বিচিত্র মণিপুর

উৎসর্গীকৃত
হ'ল

২২ শ্রাবণ, ১৩৫১

পরিচায়িকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মণিপুরের সঙ্গে বাংলাদেশের নিগূঢ় সম্বন্ধ আজ সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাঙালী আমরা মণিপুরীদের (মৈতাই) সঙ্গে কত শতাব্দী ধরে মিতালি করে আসছি সেবিষয়ে অনেকেই সজাগ নন। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে এই দিককার নানা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বর্ত্তমান পরিস্থিতির পিছনে অতীতের পটভূমিকা রচনা করেছেন। তথ্যমূলক বর্ত্তমান অতীত-ইতিহাসের রশ্মিচ্ছটায় স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে উঠেছে। কাগজ দুষ্প্রাপ্য, পাতার সংখ্যাও অতি সঙ্কীর্ণ। অথচ, বঙ্গ-মণিপুরী মিলন-উৎসবে নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা রেশন-অফিসারের রোষ-দৃষ্টি উপেক্ষা করে বেড়েই চলেছে। এত অতিথির ভিড়, তবু গ্রন্থকার স্নিগ্ধ হাস্যে ও ঔদার্য্যগুণে এই দুর্দ্দিনেও সবাইকে যথাযথ মর্য্যাদা দিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন। তাঁর 'বিচিত্র মণিপুর' বিষম যুদ্ধের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায় আজ আর্ত্তনাদ করলেও মণিপুর ও সেখানকার নরনারীদের চিত্র হিসাবে সার্থক হয়েছে। বইখানি পড়ে বাংলার সঙ্গে মণিপুরের সম্বন্ধের কথা নূতন করে ভাবতে হয়।

পূর্ব্ব ভারতে আর্য্যেরা যে অনেক পরে আসেন সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই, 'পাণ্ডববর্জ্জিত' দেশ এই কথার মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়। অথচ, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন হিড়িম্বার পাণি-পীড়ন করেন, হিড়িম্বাপুর বা বর্ত্তমান ডিমাপুরের কাছে কোন সুরম্য প্রদেশে। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন আরো একটু পূর্ব্ব দিকে এগিয়ে নাগা পর্ব্বতের নাগ-রাজ-দুহিতা উলূপীর সন্ধান পান। উলূপী আবার ছিলেন মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রিয়সখী। অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার মিলনে আর্য্য-সংস্কৃতির প্রসার ব্রহ্ম-সীমান্ত পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল। চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন ও তাঁর রাজ্য মণিপুরের কথা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আদি গ্রন্থের মধ্যে দেখা দিল। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণের ও রুক্মিণী-পরিণয়ের কাহিনী উত্তর

আসামের পারলৌহিত্য প্রদেশ পরিক্রমণ করবার সময় অনেক শুনেছি। ১৯৩৯ সালে সদিয়ার লুহিত নদী পার হয়ে পরশুরাম তীর্থ এবং বাণরাজা উষা ও অনিরুদ্ধের লীলাভূমি তেজপুর, বশিষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি দেখে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মণিপুরী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গৌহাটীতে আলাপ হয়। ১৯৪০এ রাজকুমার প্রিয়ব্রত সিংহের নিমন্ত্রণে মণিপুর শিল্প ও সাহিত্য-পরিষদের উদ্বোধন করার সৌভাগ্য হয়। ইম্‌ফলের নাট্য-গৃহে সভাপতিরূপে অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদার কথা বলেছিলাম এবং প্রসঙ্গক্রমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশীষ মণিপুরী বন্ধুদের নিবেদন করে তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের অমরকাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করা হোক্ এবং বিশুদ্ধ মণিপুরী রীতির নৃত্য-ভাষ্যে সেই কাব্যকে সার্থক করা হোক্। তাঁরা সানন্দে আমার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন।

ইম্‌ফল থেকে ফিরে বিষম অসুস্থ কবিকে যখন আমার মণিপুর অভিযানের গল্প শুনাই তখন অস্তোন্মুখ রবির মুখে যে দীপ্তি ফুটেছিল এবং মণিপুরীদের কেমন স্নিগ্ধ অন্তরে তিনি স্মরণ করেছিলেন সেকথা ভুলতে পারি না। অনেকেরই হুঁস নেই যে, অতীতের স্বপ্ন-ঘেরা মণিপুরকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের রস-চেতনায় সত্য করে তুলেছেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অনতিপূর্ব্বে তিনি একজন নৃত্যকুশল মণিপুরী শিক্ষককে শান্তিনিকেতনে যখন আনেন তখন উদয়শঙ্করের উদয় হয় নাই। 'চিত্রাঙ্গদা'র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী শিল্পের কত বড় সমঝদার ছিলেন এবং কি ভাবে সেই শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তন করে আমাদের নৃত্যকলায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন সেটি বুঝতে হয়ত কিছু সময় লাগবে।

বাংলার মধ্যযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে যে অমর গীতিকাব্যের সৃষ্টি হ'ল তার সাহিত্যাংশ ফুটে উঠল 'পদকল্পতরু'রূপে। কিন্তু, বাংলা কীর্ত্তনের সুর তাল ছন্দ ও আলাপ নবদ্বীপ থেকে বহু দূরে শ্রীচৈতন্যের পিতামহের ভিটায় শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে যে পৌঁছেছিল তা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। শ্রীহট্টের এক পাশে ত্রিপুরা রাজ্য সেখানেও দেখি গৌড়ীয়বৈষ্ণব প্রভাব, বাংলা ভাষার সমাদর ও নৃত্যকলার অপূর্ব্ব বিকাশ। শ্রীহট্টের আরেকদিকে শিলচর-বিষেণপুর

পথ অতিবাহন করে সেই গৌড়ীয় ধর্ম্ম সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষা সুদূর মণিপুরে প্রবেশ করেছিল। মৈতাই জাতি ও ভাষা তিব্বত-ব্রহ্ম (Tibeto-Burman) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। অথচ মণিপুরী কুমারীদের সখীপরিবৃত রাধাকৃষ্ণের লীলা-নাট্যের অভিনয় যখন দেখেছি ও শুনেছি তখন মনেই ছিল না যে, বাংলা ভাষার এক বর্ণ না জেনেও তারা শুধু ভক্তির অমোঘ শক্তি-বলে পদাবলীর কীর্ত্তন নিখুঁতভাবে করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাতীয় শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান এক অপূর্ব্ব নৃত্য-ভাষ্য রচনা করে চলেছে। ভারতবর্ষের কথা-কাহিনীতে নূতন প্রাণ ও নূতন রূপ দিয়েছেন আমাদের মণিপুরী বন্ধুগণ; এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বৃহত্তর ভারতেও দেখে এসেছি ব্রহ্মদেশে, শ্যামরাজ্যে, কাম্বোজ ও চম্পায়, জাভা ও বলীদ্বীপে। নাট্যশাস্ত্র-রচয়িতা ভরতমুনির সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্তান না হলেও এঁরা কৃতী ও উপযুক্ত ছন্দরসিক শিষ্য। আমাদের কথা কাহিনীর, আমাদের রামায়ণ মহাভারতের, পুরাণ ও পদাবলীর যে, বিরাট নৃত্য-ভাষ্য এঁরা রচনা করে গেছেন তার জন্য ভারতবাসী আমরা চিরদিন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। বিশ্ব-যুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে বাঙালী ও মাণপুরী আবার নূতন করে মিতালি সুরু করুক এই আবেদন গ্রন্থকার তাঁর নিপুণ রচনার ভিতর দিয়ে জানিয়ে গেছেন। তিনি পায়ে হেঁটে মণিপুরের গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন, তার পরিচয় বইখানির সর্ব্বত্র পাই। গভীর সহানুভূতির রঙে 'বিচিত্র মণিপুর'কে তিনি রাঙিয়ে তুলেছেন তাই 'খাম্বা ও থইবির' জন্মভূমি এক অভিনব তাৎপর্য্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। সেজন্য তাঁর সার্থক রচনার ভিতর দিয়ে আমার মণিপুরী বন্ধুদের শুভ কামনা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কলিকাতা

শ্রীকালিদাস নাগ

২২শে শ্রাবণ ১৩৫১

অবতরণিকা

বিচিত্র দেশ মণিপুর। এদেশের প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য যেমন নয়নমুগ্ধকর, তেমনি এখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, নৃত্যকলা ইত্যাদিও চিত্তাকর্ষক। এবারকার যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের পাঠকমহলে মণিপুর এবং মণিপুরীদের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের কৌতূহল-নিবৃত্তির পক্ষে কতকটা সহায়ক হতে পারে এই ভেবে, এ-সম্বন্ধে আমার ভ্রমণজনিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ এবং নানা পুস্তক* ও পত্রিকাদি থেকে সংগৃহীত বিবরণ প্রকাশ করলাম।

এই পুস্তকের 'মণিপুর-প্রবাসে' এবং 'মণিপুরী নৃত্য-উৎসবের চিত্র' নামক প্রবন্ধ দুটি আট-নয় বছর আগেকার লেখা। দুটি প্রবন্ধই প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। মণিপুরে বিবাহ-উৎসব নামক প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের

*যে-সমস্ত পুস্তক থেকে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলির নাম—

The Meitheis by T. C. Hodson
Naga tribes of Manipur by T. C. Hodson
My Three Years in Manipur by Mrs. Grimwood
The Garos by A. Playfair
The Sema Nagas by J. H. Hutton
The Kacharis by the Rev. S. Endle
A History of Assam by E. A. Gait
The Lampi by Lieutenant Colonel Chapman

কবি-প্রণাম—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র প্রভৃতি সম্পাদিত

প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র-সঙ্কলন—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

মণিপুরের ইতিহাস—শ্রীমুকুন্দলাল চৌধুরী প্রণীত

সম্পাদকতা-কালে ১৩৪৬ সনের আষাঢ় সংখ্যা অলকায় প্রকাশিত সৌন্দর্য্যোপাসক মণিপুরী নামক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ; বাকী প্রবন্ধগুলি সম্প্রতি লেখা। তন্মধ্যে 'খাম্বা ও থইবি' এবং 'মণিপুরের নাগা-সম্প্রদায়' যথাক্রমে রবিবাসরীয় আনন্দবাজার এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকে ব্যবহৃত কয়েকটি ছবি ডাক্তার লৈরেন সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত, বাকীগুলি আমার নিজের তোলা।

পুস্তকখানি প্রকাশ করতে গিয়ে শ্রীহট্টের ছায়ানিভৃত জামতলায় আমার সাহিত্যালোচনার নিত্যসঙ্গী শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরীর বন্ধু-প্রীতির কথা স্মরণ করছি। পুস্তক প্রণয়নে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, বন্ধুবর গোপাল ভৌমিক এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার নিকট বিশেষ উৎসাহ পেয়েছি। 'প্রবাসী'র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্লকগুলি ব্যবহার করতে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে পুস্তকখানি প্রকাশ করতে হ'ল এজন্য এতে ভুল-ত্রুটি থাকা সম্ভব।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর কালিদাস নাগ মহাশয়ের সুলিখিত পরিচায়িকাটি আমার পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন শিল্পী শ্রীফণী গুপ্ত।

কলিকাতা
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫১

শ্রীনলিনীকুমার ভ

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৯	লোধ	লোধ্র
৩৭	১৮	রাজধানী	রাজবাটী
৪৬	৫	গ্রিন্‌উড	গ্রিম্‌উড
৫৭	৩	কুপমামর্শ	কুপরামর্শ

সূচীপত্র

১। পরিচায়িকা—ডক্টর কালিদাস নাগ এম-এ, ডি-লিট্ লিখিত ।/০-।d/০
২। অবতরণিকা ... ... ||০-||/০
৩। মণিপুর-প্রবাসে ১
৪। মণিপুরে বিবাহ-উৎসব ২৫
৫। খাম্বা ও থইবি (মণিপুরী উপাখ্যান) ২৮
৬। মণিপুরী নৃত্য-উৎসবের চিত্র ৪০
৭। মণিপুরের নাগা-সম্প্রদায় ৪৫
৮। স্বাধীন মণিপুরের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় ৫৫
৯। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে মণিপুর ৬৫
১০। লাম্পি ৭৫
১১। পরিশিষ্ট—মণিপুরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী ... ৮৯



মণিপুর-প্রবাসে

শরৎপ্রভাতের প্রথম আলোর রেখা সবেমাত্র বিহগকণ্ঠের কাকলিতে সত্ত-জাগ্রত বনভূমির শীর্ষদেশকে সোনালী আভায় মণ্ডিত করে তুলেছে। মণিপুর রোড ষ্টেশনের অনতিদূরে ডিমাপুরের 'নামবার'-অরণ্যে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ভগ্ন প্রস্তরস্তম্ভসমূহের পার্শ্বে বসে কাছাড়ী রাজাদের অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়টি স্মরণ করছি। ইম্‌ফলগামী মোটর ছাড়বার এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি।

আহোমদের আসামে আগমনের বহুকাল আগে মোঙ্গোলীয় মহাজাতির বড় বা বড নামে এক শাখার লোকেরা তিব্বতের অধিত্যকা অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর অঞ্চলে এসে আড্ডা গাড়ে। কালক্রমে 'বড়' জাতির বিভিন্ন উপশাখার লোকেরা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ অঞ্চলে কোনো কোনো স্থানে, এমন কি বাংলাদেশের কোনো কোনো জেলায় পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

আসাম-বেঙ্গল রেলপথে যাঁরা লামডিং পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন ডাওতুহাজা, মাহুর, মাইবং প্রভৃতি ষ্টেশনে কতকগুলো পাহাড়ী নর-নারী সওদা করতে আসে। পুরুষদের মাথায় দীর্ঘকেশ, কানে অনেকগুলো তামার আঙটি পরানো, তাতে বনফুল গোঁজা। স্ত্রীলোকদের মাথার সাম্‌নের দিকটা কামানো, গলায় পশুর হাড়, পুঁতি, কড়ি প্রভৃতির মালা, পরনের অপ্রশস্ত মলিন বস্ত্রখণ্ডটি দিয়ে হাঁটু পর্য্যন্তও ঢাকা পড়ে না। কাছাড় জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রধানত এদের বাস। এরা বাঙালীদের নিকট কাছাড়ী নামে পরিচিত, এদের আসল নাম কিন্তু বড জাতি। এদের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত তারও নাম বড় বা বড ভাষা। এরা অবশ্য নিজেদের ডিমাসা নামে পরিচয় দেয়।

আসামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে অতীতে আহোমদের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে একদল কাছাড়ী ধনশিরি নদীতীরস্থ ডিমাপুরে এসে নূতন

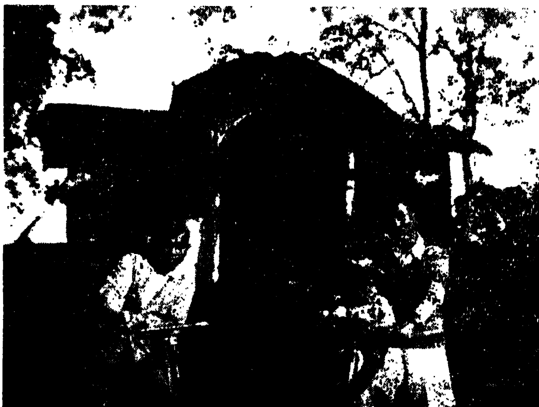
রাজধানী স্থাপন করে। আহোমরা এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে এসেও আবার তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং ডিমাপুর দখল ক'রে তারা এই সমৃদ্ধিশালী নগরীটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

কাছাড়ী রাজধানীর ভগ্নাবশেষসমূহ আসাম গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সযত্নে সংরক্ষিত। নিকটেই কোনো কাছাড়ী রাজার কাটানো স্বচ্ছসলিলা একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। নামবার জঙ্গলের মাঝখানটা পরিষ্কৃত, ভগ্নাবশেষগুলো কয়েক সারিতে সংস্থাপিত। ভগ্ন প্রাচীরগাত্রে খোদিত হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি পশুপক্ষী এবং লতাপাতা একেবারে নিখুঁত। কিন্তু তাতে একটি মাত্রও মনুষ্যমূর্ত্তি উৎকীর্ণ নেই।

নামবার জঙ্গলে কতকগুলো বৃহদায়তন একশিলাস্তম্ভ (monoliths) দেখতে পাওয়া যায়। এসব যে মৃতের উদ্দেশে নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ তাতে সন্দেহ নেই। গারোরা মৃতের উদ্দেশে যে সমস্ত খাঁজ-কাটা স্মৃতিস্তম্ভ (কিমা) নির্ম্মাণ করে সেগুলোর সঙ্গে নামবার জঙ্গলের স্তম্ভসমূহের আকৃতিগত সাদৃশ্য প্রায় ষোলো আনা। অধিকাংশ 'কিমা'ই খোদাই করা হয় ডিমাপুরের একশিলাস্তম্ভের ধাঁচে। তফাৎ কেবল এইটুকু যে, 'কিমা'গুলো কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং আয়তনে ছোট।

নামবার জঙ্গলে এই সব 'মনোলিথ' ছাড়া ইংরেজী y অক্ষর বা আমাদের হাড়িকাঠের মতন আকৃতিবিশিষ্ট আরো গুটিকতক প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান। গারোরা মৃতদেহ সংকার-কালে দাহস্থানের নিকটে ঠিক এ ধরণেরই 'গিলমিরং' নামক কাঠের খুঁটায় একটি ষাঁড়কে বেঁধে রাখে এবং উক্ত প্রাণীটির আত্মা যাতে পরলোকে গিয়ে মৃতের সেবা করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মৃতদেহ ভস্মে পরিণত হবার আগেই তাকে হত্যা করে। সেমা নাগাদের মধ্যে সর্দ্দার এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা উৎসবাদি উপলক্ষে এধরণের কাঠের স্তম্ভে রজ্জুবদ্ধ করে গো-বধ করে। গারো এবং সেমাদের জ্ঞাতি কাছাড়ীরাও যে গো-বধ করবার উদ্দেশ্যেই হাড়িকাঠের অনুরূপ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

বহুক্ষণ ভগ্নাবশেষাদি তন্ন তন্ন করে পর্য্যবেক্ষণ করে বেলা আটটা নাগাদ ইম্‌ফলগামী মোটরে এসে উঠলাম। নীচুগার্ডের গেট ছাড়িয়ে আমাদের মোটরখানা বনানীমণ্ডিত নাগাপাহাড়ে প্রবেশ ক'রে হিলিমিলি রাস্তা বেয়ে চলতে লাগল। দু-ধারে দূরপ্রসারী মহাবন, স্থানে স্থানে বনস্পতিসমূহের শীর্ষদেশ থেকে পুষ্পখচিত লতাগুচ্ছ ঝল্‌ঝলে ঝালরের মত দোলায়মান। শ্যামল বনভূমি অতিক্রম ক'রে মোটরখানা দুর্গম বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে লাগল। রাস্তার বাঁ দিকে সুগভীর খদের ওপারে সুবিন্যস্ত অনন্ত পর্ব্বতমালার বর্ণবৈচিত্র্য অপূর্ব্ব। নিকটের পাহাড়শ্রেণী ঘনসবুজ, তার পরের

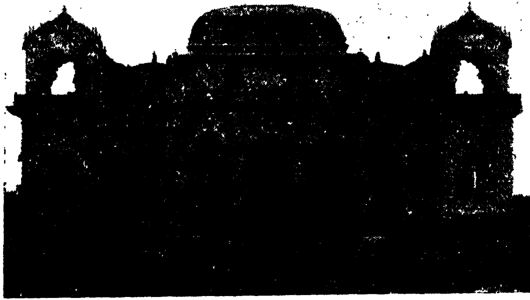


প্রাচীন কংলা বা দরবার-গৃহ

সারি পাঁশুটে রঙের, আর সকলের শেষ সারিতে সংস্থিত আকাশস্পর্শী শৈলরাজি নীলাভ। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো সবুজ আর হল্‌দে রঙের শস্যক্ষেত্রগুলোর মাঝখানে সরু নোয়ানো বাঁশের ডগায় সাদা-কালো বস্ত্রখণ্ড-সমূহ টাঙানো।

বেলা বারোটায় নাগাপাহাড়ের রাজধানী কোহিমায় এসে মোটর থামলে দেখি, রাস্তার ধারে একটা ঘরে একপাল নাগা মেয়ে-পুরুষ একটা মুরগীর খাঁচা

হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোহিমার নাগারা আঙ্গামী নাগা নামে পরিচিত। পুরুষগুলো প্রত্যেকেই লম্বায় অন্তত ছ-ফুট। এদের মাংসপেশীবহুল সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের সৌষ্ঠব দু-দণ্ড তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। প্রায় সবাইকে বলা যেতে পারে ব্যূঢ়োরস্ক আর বৃষস্কন্ধ। আসামের আর কোন পাহাড়ী জাতির মধ্যে এমন সুগঠিত অবয়ববিশিষ্ট লোক ত আমার নজরে পড়ে নি। আঙ্গামী মেয়েরাও বেশ ফরসা, দীর্ঘাঙ্গী। পুরুষদের গলায় শাঁখের টুক্‌রো দিয়ে তৈরি মালা। সর্দ্দারদের কণ্ঠাভরণের মাঝখানে আস্ত এক একটি শঙ্খ ঝুলানো, বাহুতে হাতীর দাঁতে প্রস্তুত বাজুবন্ধের মত আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার গয়না; গায়ে হাতাহীন কালো জামা, এদের কাছা-না-দিয়ে পরা কালো



বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ

রঙের কটিবাসে গাঁথা সারি সারি কড়িগুলো বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আগেকার দিনে মানুষের মাথা কেটে আনতে না পারলে আঙ্গামী পুরুষরা পরিধেয়তে কড়ি গাঁথবার অধিকারী হ'ত না। পরনের বস্ত্রখণ্ডে গাঁথা কড়ির সারির সংখ্যা থেকে কে কি পরিমাণে নরহত্যা করেছে, তা বোঝা যেত।

কোহিমাতে পুলিস-কর্ম্মচারীরা আমাদের অনুমতিপত্রগুলো পরীক্ষা ক'রে মোটর

ছাড়বার অনুমতি দিলে। মোটরখানা এখন একটার পর আর একটা উৎরাই ভেঙে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। অপরাহ্ণে 'মাও' থানায় পৌঁছবার পর আবার মোটর দাঁড় করানো হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো মুণ্ডিতমস্তক ছোট ছোট নাগা ছেলেমেয়ে বিক্রয়ার্থ নানান্ তরিতরকারী সহ এসে হাজির। ছেলেমেয়ে সকলেরই ন্যাড়া মাথায় এক একটি ক'রে টিকি। পথিপার্শ্বে বিক্রেয় দ্রব্য নিয়ে উপবিষ্ট অবিবাহিতা কিশোরীদেরও মাথার চুল খুব ছোট ক'রে ছাঁটা। বিয়ের পর নাকি আর মেয়েদের মাথার চুল কামানো হয় না। এখানকার পুরুষদের মাথার চার পাশ ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামানো, শুধু করোটির ওপর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ কেশ, চাঁদির ওপরকার চুলে ঝুঁটি-বাঁধা। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সর্ব্বাঙ্গে গয়নার প্রাচুর্য্য। তাদের কানের তেলোর ফুটোর মধ্যে লাল, কালো, সবুজ ইত্যাদি রং-বেরঙের তুলো এবং সুতোর গোছা গোঁজা, গলায় পল-তোলা রঙীন কাচ, লাল পাথর, কর্ণেলিয়ান, মাঢ়ীসমেত পশুদন্ত, পুঁতি, কাচে খচিত হরিণের হাড়, পালিশ-করা শাঁখের টুক্‌রো ইত্যাদি নানা জিনিষে তৈরি সারি সারি রকমারি হার, হাঁটু পর্য্যন্ত নোংরা বস্ত্র পরিহিত মেয়েরা লম্বাটে ধাঁজের মাটির জলপাত্রে ভরা এক একটি চাঙারি পিঠে ক'রে দল-বেঁধে রওনা হয়েছে অনতিদূরস্থ ঝরণা-তলার পানে। চল্‌তে চল্‌তে আমাদের পানে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অকারণে ফিক্ ক'রে হেসে উঠছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে মাও থেকে মোটর ছাড়লে। রাত আটটায় ইম্‌ফলে পৌঁছে মোটর-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলাম। এক গোবেচারী মাড়োয়ারী 'মহারাজ' এই ধর্ম্মশালার চৌকিদারি করেন আর 'মহারাণী' অর্থাৎ চৌকিদার-মহারাজের স্ত্রীটি মুসাফিরদের জন্যে রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করেন।

৫ই সেপ্টেম্বর। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চা-পানার্থে মহারাণীর দ্বারস্থ হলাম। ইনি যে এক জন কটু-ভাষিণী উগ্রচণ্ডা তা এই অল্প সময়ের মধ্যেই টের পেয়েছি। তার বর্ত্তুলাকার দেহের ওজন পাকা আড়াই মণ, গায়ের রং মিশ কালো, অর্দ্ধঅনাবৃত তার বিপুল উদরটি দেখে খুব সম্ভব তার স্বজাতিদেরও মনে

হিংসার উদ্রেক হয়। এদিকে ইনি কিন্তু ভারি লজ্জাবতী, আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সরমে রাঙা (?) হয়ে জিব কেটে ঘোমটা টানেন ; ওদিকে আবার আমাদের উপস্থিতিতেই 'মহারাজকে' লক্ষ্য ক'রে চোখাচোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে কসুর করেন না। তদুপরি সে-বেচারাকে উদ্দেশ ক'রে সময় সময় তারস্বরে যে-সমস্ত নিতান্ত অসঙ্গত এবং অভিধান-ছাড়া বিশেষণ প্রয়োগ করেন, সেগুলো তার কানে নিশ্চয় মধুবর্ষণ করে না।



মণিপুরীদের পোলো বা কাঙ্গাই খেলা

চা-পানান্তে ধর্ম্মশালার একান্ত সন্নিকটে অবস্থিত ইম্‌ফলের 'যাকাইরোল' বা 'জাগরণ' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ডাক্তার নৈরেন সিংহের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। আমার পরিচয় পেয়ে ডাক্তারবাবু আমায় স্বাগত করলেন। এঁর সঙ্গে মণিপুরের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক আলাপ বেশ জমে উঠল। ইনি মনে করেন যে, মণিপুরীরা হিন্দুধর্ম্মের আওতায় আসবার আগে ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও তাঁর 'সত্তর বৎসরে'

অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। অবশেষে মণিপুরের শিল্প-কলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'লে ডাঃ সিং আমায় হাতীর দাঁতের দুটি প্রেমিকপ্রেমিকার প্রতিমূর্ত্তি, ছোট ছোট বাক্স-পেটরা, পিত্তলনির্ম্মিত মণিপুরী বাচ-খেলার দৃশ্য ইত্যাদি নানারকমের জিনিষ দেখালেন। এগুলো মণিপুরী রূপকারদের উচ্চাঙ্গের শিল্পপ্রতিভার পরিচায়ক। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বল্‌লেন যে, আজ ইম্‌ফল থেকে সাত মাইল দূরবর্ত্তী 'বর' নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ দুর্গামন্দিরে অষ্টমী তিথি উপলক্ষে রাজার উপস্থিতিতে এক মস্তবড় উৎসব উদ্‌যাপিত হবে। এই সব দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমায় সঙ্গে করে 'বর'এ নিয়ে যেতে ডাঃ সিং লম্বি নামক একটি ছোকরাকে অনুরোধ করলেন।

ডাক্তার সিংহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লম্বির সঙ্গে ইম্‌ফলের রাস্তায় বেরনো গেল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দেড় হাজার ফুট উচ্চে মনোরম উপত্যকা-ভূমিতে এই নয়নমুগ্ধকর জনবহুল ইম্‌ফল নগরীটি অবস্থিত। আকাশ-ছোঁয়া পর্ব্বতমালা বৃত্তাকারে শহরটিকে ঘিরে রেখেছে। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে সুপ্রশস্ত সিধা রাজপথগুলোর উভয় পার্শ্বে সারি-বাঁধা বিরাটকায় গর্ভেলিয়া তরুশ্রেণী স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর সন্নিকটেই প্রকাণ্ড 'পোলো' খেলার মাঠ। 'কাঙ্গাই' বা পোলো এবং 'হকি' মণিপুরীদেরই নিজস্ব জাতীয় ক্রীড়া। 'পোলো' খেলায় মণিপুরীরা অপরাজেয়। ইম্‌ফলস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণ এ দুটি ক্রীড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলেই আজ সভ্যজগতে এগুলোর এত প্রচলন হয়েছে। 'পোলো'র মাঠ ছাড়িয়ে আমরা প্রাচীন রাজপ্রাসাদের পানে এগিয়ে চললাম। রাস্তার ডানদিকে ব্রিটিশ রেজিমেণ্টের ময়দান। অদূরে, প্রাচীর-ঘেরা প্রকাণ্ড কেল্লার প্রবেশপথের মুখে অবস্থিত খড়ে-ছাওয়া, আড়কাঠে খোদাই-করা 'কংলা' বা দরবার-গৃহটি গঠন-কৌশলের বৈশিষ্ট্যে নবাগত পথিকের দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকর্ষণ করে। আগে নাকি 'কংলা'র বহিঃপ্রাঙ্গণে পাথরে-তৈরি দুটো বিরাট আকারের ড্রাগন (নংসা) সংস্থাপিত ছিল। তখনকার দিনে এই 'নংসা' দুটোর সুমুখেই রাজার বিচারে

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্যেরা নাগা জল্লাদের খড়্গে পঞ্চত্বলাভ করত। অধুনা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নংসাগুলোকে কোথায় স্থানান্তরিত করেছেন, আমার পথ-প্রদর্শকের নিকট থেকে সে-সম্বন্ধে কোন হদিস্ পেলাম না। দরবার-গৃহের ঠিক সুমুখেই আন্দাজ আধ মাইল লম্বা সিধা সড়ক—এই সড়কের ওপরেই প্রতি বৎসর মণিপুরীদের 'লামচেল' বা দৌড়-প্রতিযোগিতা হয়। এই স্থানে দাঁড়িয়ে অনতিদূরে



'যাকাইরোল'-সম্পাদক ডাক্তার লৈরেন সিংহ নিংথৌজম

অবস্থিত টিকেন্দ্রজিতের পরিত্যক্ত প্রাসাদের পানে তাকিয়ে বিষাদে মন ভরে ওঠে। নিজ ভবনেই বন্দীদশায় জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে মণিপুরের মুকুটমণি, অমিতবিক্রমশালী মহাবীর টিকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এমনিতর শোচনীয়ভাবে অকালে টিকেন্দ্র-জিতের জীবনাবসান না হ'লে মণিপুরের ইতিহাস বোধ করি আজ অন্যরূপ

হ'ত। যাক্ সে কথা।—আপাততঃ দুর্গ এবং রাজপুরী ইত্যাদির বর্ণনা শেষ করা যাক। কেল্লাটির দক্ষিণ দিককার কতক অংশ একটি ডিম্বাকৃতি, শাদা গম্বুজওয়ালা লালরঙের অত্যুচ্চ ইটের পাঁচিলে ঘেরা ; পেছনে ইদানীং শুষ্ক গড়খাই। আগেকার দিনে বারো মাস এই পরিখা জলে ভর্ত্তি থাক্‌ত এবং সেপ্টেম্বর মাসে এখানেই বিপুল সমারোহের সহিত তিন দিন ব্যাপী বাচ খেলা হ'ত। উৎসবের শেষ দিনে রাজা স্বয়ং তাঁর নৌকার হাল ধরে প্রতিযোগীদের অনুগমন করতেন। এই পরিখাটির পশ্চাতে অপরিসর মণিপুর নদী প্রবাহিত।

কেল্লার যে-অংশটুকু ইটের দেওয়ালে ঘেরা ঠিক তার বিপরীত দিকে খড়ের চালাযুক্ত নাতিবৃহৎ রাজপুরী। এর এক রশিমাত্র ব্যবধানে মণিপুর-রাজবংশের ইষ্টদেবতা গোবিন্দজীর ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির আর তৎসংলগ্ন নাটমণ্ডপটি অবস্থিত। দেউলের ফাটল-ধরা দেওয়াল থেকে চূণ-বালি খসে পড়ছে, আর যে-সুরম্য নাট-মন্দির একদা নানা উৎসব উপলক্ষে নগরের শ্রেষ্ঠ নটীদের কণ্ঠসঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠত, আজ পারাবতের কূজন সেখানকার নিবিড় স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। এই পরিত্যক্ত রাজপুরী, ভগ্ন জীর্ণ শ্রীহীন দেবমন্দির আর নাটমণ্ডপ, আর সুগভীর পরিখাবেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গ ইত্যাদি দেখে, খজেনবা, গরীব নেওয়াজ, গম্ভীর সিংহ, চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি স্বাধীন মণিপুরী নৃপতিদের আমলে ইম্‌ফল যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, তা কতকটা আঁচ করতে পারা যায়।

প্রাচীন রাজপুরী থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠের মধ্যে বর্ত্তমান রাজার নবনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদটি অবস্থিত। সুমুখের শান-বাঁধানো চত্বরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা। প্রাসাদের হাতার ডানদিকে পুরনো 'কংলার' ছাঁদে তৈরি দেওয়ালহীন দরবারগৃহ আর বাঁ দিকে স্বর্ণপাতমণ্ডিত গুম্বজদ্বয়বিশিষ্ট গোবিন্দজীর মন্দির—আলিসার ওপরে গুটিকতক স্বর্ণকুম্ভ সংস্থাপিত। মন্দিরাভ্যন্তরে গোবিন্দজী এবং গৌরনিতাই প্রভৃতির মৃন্ময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরসংলগ্ন বিশাল নাটমণ্ডপের বিরাট্ স্তম্ভসমূহ বিচিত্রিত। রাজপ্রাসাদের পিছন

দিকে ইটের পাঁচিলে ঘেরা ক্রিকেট খেলার প্রকাণ্ড মাঠ। মহারাজা চূড়াচাঁদ সিংহ নাকি ছিলেন এক জন পাকা ক্রিকেট খেলোয়াড়।

ইম্ফলের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে বাঙালীপাড়ায় জনষ্টন হাইস্কুলের শিক্ষক কুমুদনাথ দে, এম-এ মহাশয়ের বাসায় এসে উপস্থিত হলাম। কুমুদ বাবু আমায় সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন।



ব্লাউজ ও শাড়ী পরিহিতা দুটি মণিপুরী লৈছাবী (কুমারী)

কুমুদ বাবুর বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা 'বর'এর পথে রওনা হলাম। রাস্তার দু-ধারে কলাবন আর বাঁশঝাড়ের অবকাশপথ দিয়ে নজরে পড়ছে ছায়া-ঢাকা সারি সারি ঘর-বাড়ি আর দু-একটা চূণকাম-করা মন্দিরের চূড়া। কোন-

কোন বাড়ির সামনে বিকশিত পদ্ম ফুলে ভর্ত্তি এক একটি সরোবর। এ-সমস্ত সুপরিচিত দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে যেন বাংলাদেশের পল্লীপথ দিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশেই ছতরির নীচে মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা দোকান-পাট সাজিয়ে বসে আছে। দলে দলে তাম্বূলরাগে রঞ্জিতাধরা নক্সা-পেড়ে আঁজিকাটা 'ফানেক'-পরা মেয়েরা চলেছে সার-বেঁধে নৃত্যচ্ছন্দে পদক্ষেপ করতে করতে উৎসবে যোগ দিতে। এরা প্রায় সকলেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। সুমুখের পানে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন সুবেশা নারীদলের এক শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে উৎসবক্ষেত্রের অভিমুখে। পথচারী পুরুষরা সংখ্যায় এত অল্প যে, এই শোভা-যাত্রার মধ্যে এরা যেন প্রক্ষিপ্ত। মেয়েদের মধ্যে কারও কারও গলায় কয়েক নর স্বর্ণহার, কানে সোনার দুল, আঙুলে সোনার আংটি ইত্যাদি অল্পস্বল্প গয়নাগাঁটি আছে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই সম্পূর্ণরূপে নিরাভরণা। নিজেদের নিরাভরণ নিটোল দেহকে এরা পুষ্পাভরণে সজ্জিত করেছে, বিবাহিতা নারীরা খোঁপায় গুঁজেছে বনফুল, কুমারী কিশোরী আর তরুণীরা কানে পরেছে ফুলের দুল, গলায় দুলিয়ে দিয়েছে ফুলের মালা, হাতে তাদের এক একটি ক'রে স-মৃণাল বিকাশোন্মুখ পদ্মকোরক। সবাকারই ললাট, নাসিকা এবং কপোলে শ্বেত চন্দনের পত্রলেখা। এই সুন্দরী তরুণীরা কি সব নেমে এসেছে কবি কালিদাসের কল্পলোক অলকা থেকে? এদের রূপ বর্ণনা করতে গিয়েই কি মহাকবি বলেছিলেন—

"হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥"

চল্‌তে চল্‌তে ক্লান্ত হয়ে কেউ কেউ পথিপার্শ্বস্থ ছতরির তলায় বসে জিরুচ্ছে আর খাবার কিনে খাচ্ছে। পসারিণীর কাছে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া আছে এক একটি পত্রপুটে পাঁচ-সাতটি ক'রে সুগন্ধি ফুল। খেয়ে-দেয়ে, যাবার সময় মেয়েরা দু-এক পয়সা খরচ ক'রে ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এদের এই পুষ্প-প্রীতি দেখে মনে পড়ল

ফুল-কেনা সম্বন্ধে মহম্মদের উপদেশ থেকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনূদিত নিম্নোক্ত কয়েকটি পংক্তি—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।
দুটি যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী!

মহাপুরুষের এই উপদেশ এরা দেখাচ্ছ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। সভ্যতাভিমানী আমাদের মতন পয়সা খরচ ক'রে পুষ্প ক্রয় করাকে অনাবশ্যক অপব্যয় ব'লে মনে করতে এরা আজও শেখে নি। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে এদের অন্তরতম প্রকৃতির নিবিড় যোগসূত্র আজও ছিন্ন হয়ে যায় নি। চার-পাঁচ মাইল এগোবার পর দেখি রাস্তার দু-ধারে ধানের ক্ষেত শরতের সোনালী রোদে ঝল্‌মল্‌ করছে। এদেশে যে অমন চোখজুড়ানো মাঠ-ভরা সোনার ধান দেখব, তা কল্পনারও অতীত ছিল। এদেশের লোকেরাও ঠিক্‌ আমাদেরই মতন, "এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে," ব'লে গর্ব্ব অনুভব করতে পারে। রাস্তার ডানদিকে ধানক্ষেতের শেষপ্রান্তে কোথাও চক্রবাল-ঘেঁষা সুদূর নীল বনরেখা, আর কোথাও বা সুস্পষ্ট দেখা যায় একেবারে সমতল ভূপৃষ্ঠ থেকে তরঙ্গায়িত পাহাড়ের মালা স্তরে স্তরে ক্রমোচ্চ ভাবে অভ্রভেদ ক'রে উঠেছে। নীল সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গমালা আকাশের নীলিমা স্পর্শ করবার জন্যে যেন আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত।

বেলা চারটার সময় 'বরে' পৌঁছে ছোট একটি টিলার উপর আরোহণ করলাম। একটি বড় চালাঘরের সাম্‌নে সু-উচ্চ সরু বাঁশের ডগায় কতকগুলো লাল কাপড়ের ঝালর এবং সেগুলোর নীচে একটা চওড়া লাল কাপড় পতাকার মত টাঙানো। গৃহাভ্যন্তরে আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ জন মণিপুরী পুরুষ করতাল বাজিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করছেন, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-জনে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে খোল বাজাচ্ছেন। কীর্ত্তনগায়ক এবং খোলবাজিয়েদের মাথায়

শাদা উষ্ণীষ, পরনে ধবধবে শাদা কোঁচানো ধুতি, কোমরে শাদা চাদর জড়ানো, গা আদুড়। গলায় তাদের উপবীত, কণ্ঠে তুলসীর মালা, ললাটে চন্দনের তিলক এবং সিঁদুরের ফোঁটা, সর্ব্বাঙ্গে বৈষ্ণবের নিদর্শন-চিহ্ন হরিনামের ছাপ। কিছু সময় কীর্ত্তন শুনে, দুর্গামন্দিরে প্রবেশ কর্‌লাম। একটি কক্ষে মেঝের ওপর এক সারিতে কতকগুলো সিঁদুরমাখানো শিলাখণ্ডের নিকট বসে মণিপুরী পাণ্ডারা দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করছে। এই প্রস্তরখণ্ডগুলোর নাম 'লাইফাম' অর্থাৎ দেবীর অধিষ্ঠানস্থল। এ ছাড়া এ মন্দিরে দুর্গার কোনো মূর্ত্তি নেই। মন্দিরের পিছন দিকে মেরাপ বেঁধে মাটিতে বিছানো ফালাও বিছানায় রাজার বসবার ঠাঁই করা হয়েছে। হঠাৎ অদূরে ব্যাণ্ডের বাজনা বেজে উঠল। অনতিকালপরেই রাজা সৈন্যদল সমভিব্যাহারে উৎসবস্থলে এসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন। এদিকে, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। সুতরাং রাজদর্শনের পরই আমরা ইম্‌ফলের পথে রওনা হলাম। শহরে পৌঁছে নেমন্তন্ন রক্ষার জন্যে কুমুদ বাবুর বাসায় গিয়ে শুনলাম যে আজ বাবুপাড়ায় মণিপুরীদের দ্বারা 'খাম্বা আর থইবি' নামক একটি পালা অভিনীত হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর মণিপুরী অভিনয় দেখবার উদ্দেশ্যে যাত্রার আসরে যাওয়া গেল।

অভিনয় বহুক্ষণ সুরু হয়েছে। এখন রাজকুমারী 'থইবি'র জ্যেষ্ঠতাত মহারাজ 'চিংখু তেলহেইবা' আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে ঢোলের বাজনার তালে তালে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে সবাইকার কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছেন। দেশে যাত্রার আসরে বহু বার ভীমসেনদের হাঁকডাক শুনে আঁত্‌কে উঠেছি। কিন্তু এই বীরবরের ঢোলের আওয়াজ ছাপানো ভীম-নাদের কাছে সে-সমস্ত কোথায় লাগে; আমাদের যাত্রা-দলের ভীম-মশাইরা এখানে এসে দিনকতক এই প্রচণ্ড অভিনেতাটির শাগরেদি করলে আসর আরও সরগরম ক'রে তুল্‌তে পারতেন। যাক্, যতক্ষণ বাক্যযুদ্ধ চলছিল ততক্ষণ অবশ্য আশঙ্কার কোনো হেতু ছিল না। কিন্তু শেষে যখন মহারাজ অসিযুদ্ধ অর্থাৎ লম্ফঝম্ফ ক'রে বেমালুম তলোয়ার ঘুরিয়ে ধুন্ধুমার বাধিয়ে তুললেন, তখন অচিরেই সামিয়ানায় টাঙানো

পেট্রোমাক্সটা চুরমার হয়ে একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটবে ভেবে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই বিপর্য্যয় কাণ্ড সত্ত্বেও কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। 'পথের পাঁচালী'র বিচিত্রকেতুর মত ইনিও দেখছি সব বাঁচিয়ে কেরামতি দেখাতে জানেন, বহুক্ষণ লাফানো-ঝাঁপানোর পর মহারাজ ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগলেন। একটু বাদে মাথায় পাগড়ি, গায়ে সাটিনের কোর্ত্তা একটি যুবক আর কুমারী-বেশে সজ্জিত একটি সুশ্রী বালক রঙ্গস্থলে এসে নাচ সুরু করলে। বালকটি সেজেছে রাজকুমারী 'থইবি' আর যুবকটি নিয়েছে রাজকুমারীর প্রেমাস্পদ 'খাম্বা'র ভূমিকা। এদের নৃত্য শেষ হ'লে এক ব্যক্তি বাঁশ ও কাপড় দিয়ে তৈরি একটা ষাঁড়কে রঙ্গস্থলে নিয়ে এল। তখন 'খাম্বা'র ভূমিকা-অভিনেতা যুবকটি কিছু সময় বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী সহকারে লাফালাফি ক'রে অবশেষে নিশ্চলভাবে খাড়া হয়ে এই নকল ষাঁড়টার কানের কাছে মুখ নিয়ে কান-ফাটা আর্ত্তনাদ জুড়ে দিলে। এর তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে আমার পাশেই উপবিষ্ট মণিপুরপ্রবাসী জনৈক বাঙালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা ক'রে অবগত হলাম যে, 'খাম্বা' আর 'থইবি'র মূল উপাখ্যানে আছে, 'খাম্বা' শারীরিক শক্তি প্রয়োগে একটা অমিতবলশালী দুরন্ত পাগলা ষাঁড়কে বাগ মানাতে অসমর্থ হয়ে অবশেষে সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি প্রভাবে উক্ত চতুষ্পদটির মন গলিয়ে তাকে বন্দী করে। আপাততঃ সেই ব্যাপারটারই নাকি অভিনয় চল্‌ছে। ওঃ! তাই'লে আমি যে জিনিষটাকে আর্ত্তনাদ মনে করেছিলাম তার নাম সঙ্গীত! কিন্তু এই প্রাণান্তকর সঙ্গীতের চোটে আমার যে মাথায় খুন চড়বার যোগাড়। এর চাইতে বরং একটি জীবন্ত ষাঁড় আসরে এসে যদি সঙ্গীত জুড়ে দিয়ে আমাদের মন গলাবার প্রয়াস সুরু ক'রে দিত, তাহলেও বোধ করি এতদূর অসহ্য হয়ে উঠত না। বাস্তবিক এই মণিপুরী সঙ্গীত যে কিরূপ কর্ণপীড়া-দায়ক তা স্বকর্ণে না শুনলে আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না। তবু রক্ষা এই যে, অল্পক্ষণ মধ্যেই মহাসঙ্গীত এবং পালা সায় হ'ল।

৭ই সেপ্টেম্বর। আজ বিজয়া দশমী। মণিপুরীদের মতে আজকের দিনটি

বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ এবং পবিত্র দিন। আজ এই পরম শুভদিনে বর্ত্তমান রাজবাটীর পিছন দিককার খাতের পাড়ে 'কুয়াক-তল্‌বা' নামক বিরাট্ উৎসব রাজ-সমারোহে সমাপিত হবে। রাজা স্বয়ং এবং তাঁর প্রধান অমাত্য আজ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হয়ে সমবেত প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে তাদের কল্যাণ-সাধনব্রত সমগ্র বৎসর ধরে কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হবেন।

হৃদয়ে কৌতূহল অপরিসীম, সুতরাং দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করেই, চন্‌চনে রোদের মধ্যে মাইল-দেড়েক হেঁটে খালের পাড়ে এসে পৌঁছলাম। কি প্রকাণ্ড জনতা এখানে, লোক একেবারে গিস্‌গিস্ করছে। উৎসবের ঢের দেরি কিন্তু স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা বিভিন্ন সারিতে বিভক্ত হয়ে কেমন ধীর স্থির শান্ত ভাবে বসে আছে। হট্টগোলের লেশমাত্রও নেই। বহুক্ষণ পরে উলঙ্গপ্রায় নাগাদের দ্বারা বাহিত ডুলিতে ক'রে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সর্দ্দারগণ একে একে উৎসব-ক্ষেত্রে এসে জমায়েৎ হ'তে লাগলেন। মস্তকে তাঁদের বেগুনী রঙের পুষ্পস্তবকে শোভিত শাদা উষ্ণীষ, গলায় কয়েক ছড়া ফুলের মালা, হাতে ভারী ওজনের খাঁজ-কাটা নিরেট সোনার চুড়ি, গায়ে চুড়িদার হাতাযুক্ত লম্বা ধবধবে শাদা জামা, পরনে নক্‌সা-ছাপা মালকোঁচা-মারা কাপড়। ডুলির 'পরে হল্‌দে রঙের ঝালর-দেওয়া লাল-কালো এবং মেটে রঙের প্রকাণ্ড গোল ছাতা, সম্মুখভাগে মহাবীরের মূর্ত্তি-আঁকা পতাকা, আর ভিতরে বিভিন্ন আধারে রাজার জন্যে আনীত নানা সওগাৎ। খানিক বাদে রাজপুরী থেকে এক বিচিত্র শোভাযাত্রা উৎসবক্ষেত্রের পানে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। সর্ব্বাগ্রে আস্‌ছেন অশ্বারোহী-সৈন্যদল-পরিবৃত রাজা প্রকাণ্ড এক হাতীর পিঠে সোনালী জরির চওড়া ফিতেয়-মোড়া কাচে খচিত রগরগে-লাল মখমলের আচ্ছাদনযুক্ত হাওদায় বসে। মাথার ওপর তাঁর ময়ুরপুচ্ছ-নির্ম্মিত উত্তরচ্ছদ। তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক জনের হাতে সবুজ মখমলে তৈরি সোনালী জরির ফুল-তোলা ছোট একটি ছাতা। হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় অন্য এক জন উভয় হস্তে ধরে রেখেছেন একটি স্বর্ণখচিত আড়ানি, রাজ্যের

অধিনায়ক, অমাত্যবর্গ এবং পাত্রমিত্রগণ চলেছেন পৃথক পৃথক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে। সবুজ কোটপ্যাণ্ট-পরা পদাতিক সৈন্যদল সার বেঁধে চলেছে ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে মার্চ্চ করতে করতে, পুরোভাগে তাদের বিচিত্রিত ধ্বজা



'কুয়াক-তল্‌বা' উৎসবে ডুলিতে গ্রাম-প্রধানের আগমন

এবং সুদীর্ঘ বর্শাহস্তে জনকতক সৈন্য, আর মাঝখানে ঘেরাটোপ-দেওয়া একটি চতুর্দ্দোলা। সকলের পিছনে আস্‌ছে খোলকরতাল সহ কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়।

উৎসবক্ষেত্রে এসে গজপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ ক'রে রাজা পাত্রমিত্র সভাসদ এবং সর্দ্দারগণপরিবৃত হয়ে সদ্যনির্ম্মিত একটি চালাঘরে মেঝেয় পাতা সুপ্রশস্ত লাল বস্ত্রখণ্ডের 'পরে উপবেশন করলেন। ওদিকে প্রধান অমাত্যও পাশাপাশি অবস্থিত আর-একটি ঘরে স্বীয় পার্শ্বচরগণ বেষ্টিত হয়ে অধিষ্ঠিত হলেন। রাজার মাথায় শাদা পাগড়ি, গায়ে শাদা সার্ট, পরনে ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি, কটিতে সাদা চাদর জড়ানো। পাত্রমিত্রদের পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার দেখবার জিনিষ। অধিকাংশেরই গায়ে সবুজ সাটিনের কোর্ত্তা, বাহুতে সোনার বাজুবন্ধ, হাতে সোনার চুড়ি, পরনে জরদা গোলাপী লাল ইত্যাদি নানা রঙের নক্‌সা-দার সিল্কের কাপড়, মাথায় পুষ্পশোভিত উষ্ণীষ। রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট দু-জনের হাতে সিংহমুখো সোনার মুষল। হুঁকোবরদার, তাম্বুল-করঙ্কবাহী ইত্যাদি সকলেই যে যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসেছে। অনতিদূরে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত বিরাট ধ্বজাসমূহ বাতাসে পত্‌পত্‌ ক'রে উড়ছে।

খানিক বাদে রঙীন বস্ত্রপরিহিত জনকতক সৈন্য উৎসবপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে সুরু করলে বর্শানৃত্য। এক হাতে তাদের পশুলোমে শোভিত সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ বর্শা, অন্য হাতে মজবুত ঢাল। পায়ে চামড়ায় তৈরি তুলোভরা পাদচ্ছদ, নৃত্য অন্তে এরা উপুড় হয়ে মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে বাহুগুলো সুমুখের পানে প্রসারিত ক'রে রাজাকে প্রণতি জানালে। তার পর এল বছর-নয়েকের একটি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুকুমার শিশু, দু-হাতে দু'খানা শাণিত তরবারি ক্ষিপ্রগতিতে এবং অপূর্ব্ব কৌশলে ঘুরিয়ে এই বীরশিশু অসি-ক্রীড়ার নৈপুণ্যে সবাইকার তাক লাগিয়ে দিলে। এই সময় আজানুলম্বিত কালো কোর্ত্তা পরিহিত কয়েকজন যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রাজপ্রশস্তি আবৃত্তি করলে আর কোটপ্যাণ্ট-পরা সৈন্যেরা রাজাকে প্রণাম করবার জন্যে ভূঁয়ে লুটোবামাত্র এরা তাদের সর্ব্বাঙ্গ লম্বা চাদরে ঢেকে দিলে। অকস্মাৎ গম্ভীর নির্ঘোষে যুগপৎ বেজে উঠল কতকগুলো শাঁখ, সঙ্গে সঙ্গেই রাজা গাত্রোত্থান ক'রে ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি অবস্থিত আর একটি পর্দ্দা-ঘেরা ছোট ঘরের ভিতর ঢুক্‌লেন। সেখানকার কৃত্য অন্তে রাজা পুনরায় পূর্ব্ব-স্থানে এসে

আসন গ্রহণ করবার পর, তাঁরই নির্দ্দেশমত সর্দ্দারদের মধ্যে যারা এ বছর কোন-না-কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হয়েছে, তাদের সম্মানিত করবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার পরিচ্ছদ, পাখীর পালক এবং এমনি ধরণের আরও নানা জিনিষ বিতরণ করা হ'ল। অতঃপর শোভাযাত্রাটি পুনর্গঠিত হয়ে এগিয়ে চল্‌ল রাজপুরীর দিকে। পুরদ্বারের নিকট এসে দেখি মহার্ঘ পরিচ্ছদে ভূষিতা অপূর্ব্ব-সুন্দরী রাজান্তঃপুরিকারা চিত্রার্পিতবৎ প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রার সমারোহ অবলোকন করছেন। রাজবাটীর সুমুখের ফাঁকা ময়দানে পৌঁছে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমিও তখন আমার আস্তানার পথ ধরলাম।

মইরাঙের পথে—লোগতাক হ্রদ

৮ই সেপ্টেম্বর। ক্ষান্ত-উৎসব ইম্‌ফল নগরী আজ ভোরবেলা থেকেই একেবারে নিঝুম। এই কয় দিনের অনিয়ম আর ঘোরাঘুরির দরুন আজ আর নড়তে-চড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু মনে পড়ল যে, ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে এবং মণিপুরের সুপ্রসিদ্ধ লোগতাক হ্রদ এখনও দেখা হয় নি। চট্‌পট শরীরটাকে চান্‌কে নিয়ে মাইলখানেক রাস্তা হেঁটে এসে মইরাংগামী মোটর ধরলাম। মইরাং ইম্‌ফল থেকে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখান থেকেই নৌকা ক'রে হ্রদ দেখতে যেতে হয়। ডাঃ লৈরেন সিংহের নিকট থেকে মাইরাংএর খাইদ্রাক্‌পা বা প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নিকট লিখিত একখানা পরিচয়-পত্র পূর্ব্বেই যোগাড় করা ছিল।

মোটরটা মণিপুরী মেয়েতে ভর্ত্তি। এদেশে পুরুষদের চাইতে মেয়েদের সংখ্যা যে ঢের বেশী, তা হাটে-ঘাটে, রাস্তায়, মোটরে সর্ব্বত্রই নজরে পড়ে। এদেশে এসে অবধি একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে, এখানকার বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা কুমারীদের মত লাবণ্যময়ী নয়। এর হেতুটা বোধ করি এই যে, বিয়ের পর মেয়েদের হাট-বাজার করা থেকে সুরু ক'রে সব রকম খাটুনি অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় অনতিকাল মধ্যেই তাদের চেহারার লাবণ্যটুকু

নিঃশেষে উবে যায়। সে যাই হোক, মোটরে ঠিক আমার পাশেই যে তরুণী কুমারীটি বসেছেন, তিনি কিন্তু অনুপম রূপলাবণ্যবতী। গরমের চোটে শ্রীমতী আশমানী রঙের গাত্রাবরণ (ইনাফি) খুলে কোমরে জড়ালেন। অনাবৃত সুগৌর মুক্তামসৃণ অংস-দেশ, গ্রীবা আর সুডৌল বাহুদুটি যেন কোন সুনিপুণ রূপকার পাথর কুঁদে বহু আয়াসে গড়েছে। অর্দ্ধবৃত্তাকারে কাটা ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ-বেষ্টিত গোল মুখখানা যেন মেঘে-ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদের মত রহস্যাবৃত। টানা টানা সুন্দর চোখ দুটিতে বনহরিণীর মত চকিত দৃষ্টি। ডান গালে, ছোট একটি কালো তিলও নজরে পড়ল। মণিপুরে যদি তেমন সৌন্দর্য্য-পিয়াসী কবি কেউ থাকেন, তা হ'লে এই তিলটির বদলে তিনি যে অকাতরে ইম্‌ফলের রাজসিংহাসন দিয়ে দিতে রাজী হবেন, তাতে তিলমাত্রও সংশয় নেই।

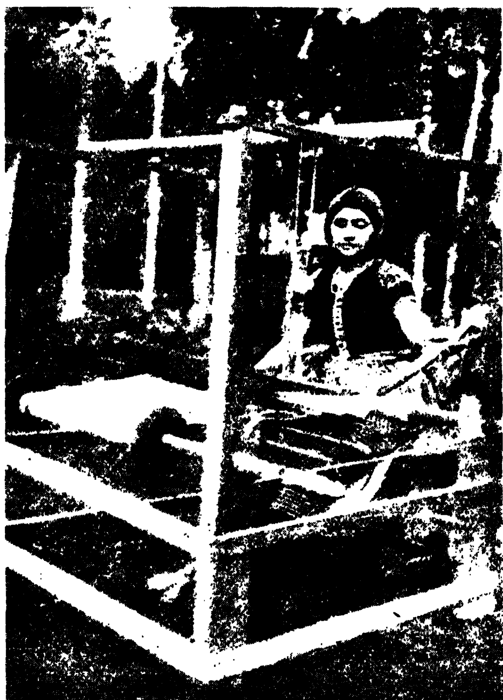
তরুণীর সৌন্দর্য্য-নিরীক্ষণ সমাপন ক'রে অবশেষে পথ-দৃশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করা গেল। দু-ধারে দিকচক্রবাল পর্য্যন্ত প্রসারিত, কোথাও হিরণবরণ কোথাও বা মরকতহরিৎ ধানের ক্ষেতে শরতের সোনালী রোদের ঝলমলানি। এখানে-সেখানে তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন এক একটি পল্লী। অবিকল বাংলাদেশের অনুরূপ শ্যামলশ্রীমণ্ডিত অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবি। ধানক্ষেতের পার্শ্বস্থ অনতিগভীর খালে মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা পলো ইত্যাদি দিয়ে মাছ ধরছে।

বেলা ঠিক বারোটার সময় মইরাঙে পৌঁছে মোটর থেকে নেমে এক মণিপুরী ছোকরাকে সামনে পেয়ে, তাকে ডাঃ সিংহের চিঠিখানা দেখালাম। চিঠিখানা পড়ে সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বল্‌লে যে, সে থাইদ্রাকৃপা তোম্বসিংহের নাতি, নাম তার মাঙ্গি, এবং আমাকে সঙ্গে ক'রে থাইদ্রাক্‌পার বাড়িতে নিয়ে এল। বাড়ির সাম্‌নেটা চালাযুক্ত মাটির দেয়ালে ঘেরা। ভিতরে প্রশস্ত আঙিনায় বেড়া-ঘেরা তুলসী-মঞ্চ। বাসগৃহটি সুবিশাল এবং সুদৃশ্য। ঘরের খুঁটি এবং কড়ি ইত্যাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মজুবত শালকাঠে তৈরি। এই বিরাট ভবনের তুলনায় দরজা জানালাগুলো আয়তনে ছোট এবং সংখ্যায় কম বলে গৃহাভ্যন্তর স্বল্পালোকিত। ঘর-দোর সমস্তই তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, উত্তমরূপে নিকানো-

পুছানো। ঘরের দাওয়ায় আন্দাজ আধ হাত উঁচু একটা খাটুলিতে বসে পীতবাস-পরিহিত প্রকাণ্ড জোয়ান খাইদ্রাক্‌পা ধূমপানে রত। মাঙ্গি আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলে, ইনি 'ভাই' বলে আমায় সম্বোধন করেই আকার ইঙ্গিতে মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। বুঝলাম বাংলা ভাষার ঐ একটি মাত্র শব্দই তাঁর পুঁজি। মাঙ্গি অবশ্য দোভাষীর কাজ ক'রে মুস্কিল আসান করলে।

খানিক জিরিয়ে, লোগতাক যাত্রার উদ্দেশ্যে মাঙ্গি এবং আরও কয়েক জন সহ নদীতে এসে নৌকায় উঠলাম। একটা আস্ত গাছ কুঁদে নৌকাখানা তৈরি, এত অপ্রশস্ত যে পাশাপাশি দু-জন পর্য্যন্ত বসবার জো নেই। খালের মত অপ্রশস্ত এবং অগভীর নদীটির বুকের উপর দিয়ে আমাদের নৌকাখানা এগিয়ে চল্‌ল। দু-ধারে দিগন্তবিস্তৃত তৃণ-ভূমিতে গরু, মোষ, টাটুঘোড়া ইত্যাদি বিচরণ করছে। দূরে ঝাঁকে ঝাঁকে বলাকাশ্রেণী বসে রয়েছে,—দেখে মনে হয় যেন সবুজের উপর শাদা রঙের ছোপ। নদী ছাড়িয়ে তার পর নীবার-জাতীয় এক প্রকার ধানগাছে পরিপূর্ণ এক সুবিস্তীর্ণ জলায় এসে পড়লাম। যেদিকে তাকাই খালি সবুজ আর সবুজ, পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যেন সবুজের বান ডেকেছে। অবশেষে যখন হ্রদের মুখে এসে পৌছলাম তখন চারিদিককার দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। রহস্যময়ী প্রকৃতি তাঁর মুখের ওপর থেকে সবুজ ঘোমটাখানা অপসারিত ক'রে কি অপূর্ব্বসুন্দর নয়নমুগ্ধকর রূপেই না আমার বিস্মতবিমুগ্ধ দৃষ্টির সাম্‌নে আত্মপ্রকাশ করলেন। সুমুখে স্বচ্ছ নীল স্থির অচঞ্চল বারিরাশির অনন্ত বিস্তার। সেই দিগন্তবিসারী জলরাশিমধ্যে কোথাও বিচিত্র বর্ণের পুষ্পখচিত জলজ তৃণময় ভাসন্ত দ্বীপমালা, কোথাও বনরাজিশ্যাম ছোট এক-একটি পাহাড়। নীল আকাশের কোল-ঘেঁষা ঘন-নীল পাহাড়ের সারি এই বিশাল হ্রদকে চতুষ্পার্শ্বে বলয়াকারে ঘিরে রেখেছে। আকাশ আর পাহাড়ের নীলিমার সঙ্গে হ্রদের নীলিমার সে এক অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি। হ্রদমধ্যে মাথায় পাগড়ি-বাঁধা অনাবৃত-উর্দ্ধাঙ্গ নিটোলদেহা স্ত্রীলোকরা নৌকা বেয়ে চলেছে। কোনো কোনো নৌকায় একটি তরুণী পিছনে বসে ধরেছে হাল আর মাঝখানে

দাঁড়িয়ে আর একটি মেয়ে জাল ফেলে মাছ ধরছে। একেবারে তন্ময় হয়ে এই সমস্ত ছবির পর ছবি দেখছি আর মনে হচ্ছে যেন এক মায়া-ঘেরা রূপকথার দেশের ভিতর দিয়ে চলেছি। ক্রমে, নৌকাখানা আমাদের বাঁশবনে ভরা হ্রদগর্ভস্থ ছোট একটি পাহাড়ের পাদমূলে গিয়ে পৌছল। দূর থেকে যে-পাহাড়টিকে শুধু বনময় বলে মনে হয়েছিল, নিকটে এসে দেখি, তার গায়ে সারি সারি ঘর-বাড়ি।



বস্ত্র-বয়নরত মণিপুরী লৈছাবী

সভ্য-জগতের সংস্রব থেকে সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন এই পাহাড়-দ্বীপবাসীরা কি ভাবে জীবন যাপন করে তা দেখবার জন্যে নৌকা বেঁধে কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে এক

বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গৃহস্বামিনী দাওয়ায় মাদুর পেতে দিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করলে। একপাল মেয়ে সেখানে বসে সুতো কাটছে আর তাঁত বুনছে কয়েকটি স্ত্রীলোক ঢেঁকিশালে ধান ভানছে। উঠানে কয়েকটি লালরঙের মোষ বাঁধা। একটেরে এক থুথ্‌থুড়ে বুড়ী জবুথবু হয়ে রোদে বসে লম্বা হাতাওয়ালা একটা কালো কোর্ত্তায় বোতাম পরাচ্ছে। সমস্ত বস্তী অসংখ্য সারস এবং চড়ুই ইত্যাদি নানা পাখীর কাকলিতে মুখরিত। নানা প্রকার শব্দের সংমিশ্রণ এক বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের ওপাশে মণিপুর-রাজ্যের 'হাইকর' বা ফলের বাগান। উদ্যান-পালের অনুমতি নিয়ে দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খাড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম। সেই অত্যুচ্চ স্থান থেকে বহুনিম্নস্থ পাহাড় এবং দ্বীপমালায় খচিত লোগতাক হ্রদটি পটে-আঁকা ছবিটির মত দৃশ্যমান হ'ল। ফলের বাগান দেখে নেমে এসে আবার হ্রদের জলে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া গেল। মইরাঙে ফিরে যখন নৌকা থেকে অবতরণ করলাম তখন শুক্লা একাদশীর খণ্ড চাঁদ থেকে ঝরে-পড়া কুন্দশুভ্রজ্যোৎস্নাধারা অদূরস্থিত পাহাড়টিকে অপরূপ মায়াময় ক'রে তুলেছে।

রাত্রিকার ভোজনপর্ব্ব চুকলে খোলা বারান্দায় আমার শয়নের স্থান নির্দ্দেশ করা হ'ল। দেখে আমার ত চক্ষুস্থির! বাড়িতে ঘর মোটে একখানা। আমরা ঘরে ঢুকলে আবার এদের জাত যায়; তাই এ ব্যবস্থা। মাঙ্গি যথেষ্ট অভয় দিলেও ভরসা পেলাম না। এখানকার ঝোপে-জঙ্গলে হিংস্রপশুদের বিদ্যমানতা খুবই সম্ভব এবং নিশ্চয়ই তারা এ জায়গার অধিবাসীদের মত বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়ে ওঠে নি। রাত্রে যদি তাঁদের মধ্যে কেউ দয়া ক'রে শুভাগমন করেন, তা হ'লে খাইদ্রাক্‌পাকে যে কাল প্রভাতে অতিথি-সৎকারের পরিবর্ত্তে মৃত-সংকারের আয়োজন করতে হবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। ভয়ে আর উদ্বেগে সারা রাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

৯ই সেপ্টেম্বর। আজ সকাল-বেলা মইরাঙের অধিষ্ঠাতা দেবতা থাং জিংএর মন্দির দেখতে আসা গেল। মন্দির-সংলগ্ন প্রশস্ত আঙিনায় নৃত্যের স্থান।

মইরাঙের মণিপুরী মেয়েদের নাচ অনুপম। নৃত্যশিল্পী মণি বর্দ্ধন, শুনলাম, নৃত্য-শিক্ষা ব্যপদেশে মণিপুরে অবস্থানকালে নাচ দেখতে একবার এখানে এসেছিলেন।



রাস—
মণিপুরী নৃত্য

বেলা ছুটোর সময় বিষেণপুরের দিক থেকে একবার বেড়িয়ে আসবার উদ্দেশ্যে মোটরে এসে বসলাম। মোটর ছাড়বার কিছুক্ষণ আগে মাঙ্গি, বেজায় বেঁটে শিম্পাঞ্জীর মত আকৃতিবিশিষ্ট এক ছোকরা সহ হাজির। ছোকরাটি এসেই একেবারে যাত্রার দলের দূতের ভঙ্গীতে, বঙ্গভাষার সপিণ্ডীকরণপূর্ব্বক বললে, "আমি আপনাকে একটা কঠা নিবেডন করিটে এসেসে।" বললাম, "ভাল, অসঙ্কোচে কর 'নিবেডন'।" শ্রীমানের নিবেদন শুনলে কিন্তু শিক্ষিতা বাঙালী কুমারীরা লজ্জায় অধোবদন হবেন। তার একান্ত ইচ্ছা সে একটি লেখাপড়া-জানা বাঙালী মেয়ের পাণিগ্রহণ করে আর আমাকে ঘটকালিতে

নিযুক্ত করতে চায়। বামনাবতারটির এই উৎকট ইচ্ছার মূলে কি, তা নির্জ্জানবিৎ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ই বলতে পারেন। আমি তাকে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতেই সে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "কিন্টু যদি প্রেম হই, টবে?" বাস্-রে, এ যে বিকৃত বঙ্গভাষায় সেই দুরূহতম চিরন্তন প্রশ্ন। প্রেমিক-প্রবরের এই জটিল প্রশ্নের কি জবাব দেব ভাবছি, এমন সময় এই নাটকীয় মুহূর্ত্তে, ড্রাইভারের কি অন্যায়, মোটরে ষ্টার্ট দিলে। মোটরে বসে বসে ভাবতে লাগলাম, বামন-মশায় চাঁদ ধরবার আশায় যে-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তাতে শেষটায় তাঁর অদৃষ্টে না কোনো দুর্গতি ঘটে।

মণিপুরে বিবাহ-উৎসব

সেদিন ছিল শারদ-পূর্ণিমার রাত্রি। মইরাংএর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরে বসে জনকতক মণিপুরী ছেলেছোকরার সঙ্গে গল্প করছিলাম। এমন সময় দেখি, একটি শোভা-যাত্রা ভিন্-গাঁয়ের দিকে চলেছে মেঠো পথ ধরে, পুরোভাগে এক একটি বেতের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে রূপসী তরুণীর দল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম বরকে সঙ্গে নিয়ে এরা সব রওনা হয়েছে কনের বাড়ীর উদ্দেশে। মণিপুরী বিয়ে দেখবার জন্যে মনে কৌতূহল জাগল, আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম।

শরৎকালের শেফালি-শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথিনী, পথের উভয় পার্শ্বে সুদূর-প্রসারী তৃণক্ষেত্রের মাথায় প্রস্ফুটিত থোকা-থোকা শাদা ফুলগুলো যেন জমাট-বাঁধা জ্যোৎস্নার টুক্‌রো। উত্তর দিকে দিগন্ত-লীন পাহাড়টি যেন সুদূরের স্বপ্ন-মাখানো।

রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে মাচার ওপর তৈরি জঙ্গলীদের সারি সারি বাড়ী-ঘর। দাওয়ায় উলঙ্গপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ জলন্ত আগুনের চারপাশে মণ্ডলাকারে বসে শূকরের মাংস ঝলসে খাচ্ছে।

কত দূর-প্রসারিত জনবিরল প্রান্তর আর গহন অরণ্যানী অতিক্রম ক'রে অবশেষে আমরা গভীর রাত্রে বন-নিবিড় এক বস্তিতে কনের বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। আঙিনায় এক মনোরম কদলীকুঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলো জ্বলন্ত মশাল মাটিতে পোঁতা। বর কুঞ্জে প্রবেশ করবামাত্র একটি এয়োস্ত্রী তার মাথায় ছড়িয়ে দিলে একরাশ সুগন্ধি ফুল। বর তারপর নাটমণ্ডপে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড দর্পণের সুমুখে বসল। একধারে মাথায় পাগড়ি, আদুড়-গা আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ জন পুরুষ অর্দ্ধবৃত্তাকারে বসে খোল করতাল সংযোগে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর।

মাঝে মাঝে শোনা যায় কীর্ত্তন ছাপিয়ে বহুজনের উচ্চ কণ্ঠের হর্ষধ্বনি। একটু বাদে দু'তিন জন বয়স্ক লোক বরকে সঙ্গে করে কন্যা-পক্ষের পূজনীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। বর মাটিতে লুটিয়ে প্রত্যেককেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করছে, আর প্রণম্য ব্যক্তিরা মাথায় ফুল দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করছেন।

বিয়ের লগ্নের পূর্ব্বক্ষণে বর ঘরের পাশে একটি জলচৌকির ওপরে আসন গ্রহণ করলে। নীচে মেঝের ওপর পুরোহিত বসে আছেন শান্তিজল ইত্যাদি নিয়ে। একটি বিবাহিতা মহিলা কনেকে সঙ্গে করে বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। বস্ত্রালঙ্কারের ছটায় কনে ঝলমল করছে। পরনে তার ময়ূরকণ্ঠী রঙের মখমলী 'পলয়'। গায়ে ঘন সবুজ সাটিনে তৈরি সোনালী-রুপালী চুমকি-বসানো জ্যাকেট। মাথায় নকল মুক্তার ঝালর-দোলানো সুন্দর মুকুট। সর্ব্বাঙ্গ তার বিবিধ স্বর্ণ এবং রজত-আভরণে ভূষিত।

পুরোহিতের নির্দ্দেশে কনে বরের পায়ের কাছে বসল। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের হাতের মন্দিরাগুলো তালে তালে বেজে উঠল, সুরু হ'ল সমবেত নারীকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত। পুরোহিত বরের চাদর দিয়ে বরকনের হাতে বাঁধলেন রাখী। তাদের বদ্ধপাণির ওপর একটি সরায় কিছু কদলী রাখা হল। পুরোহিত আরম্ভ করলেন মন্ত্রপাঠ, আর সকলে সরার ওপর নানা সওগাত, টাকা পয়সা ইত্যাদি রাখতে লাগল। অবশেষে তাদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল। কনে একটা বেতের সাজিতে ফুল নিয়ে বরের মাথায় ও পায়ে স্খলিত হস্তে অঞ্জলি দিতে দিতে মন্থরপদক্ষেপে সপ্তপ্রদক্ষিণ সুরু করলে। মালা-বদলের পালা শেষ হলে বরকন্যাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সকলে বারান্দায় পাত পেতে বসলে পর বর স্বহস্তে তাদের পরিবেশন করলে। তারপর ঘরের ভিতরে একটা মাদুর পেতে বরকন্যা তাতে পাশাপাশি বসল এবং একে অপরকে সন্দেশ ও পান-সুপারি খাইয়ে দিলে। বিবাহ-সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সমাধা হ'লে কনেকে একটা ডুলিতে ক'রে বরযাত্রীদল নিজেদের গৃহাভিমুখে রওনা হ'ল।

ফিরবার পথে শুনলাম যে, ছয়দিন পরে কনের বাড়ীতে এক বিরাট্ ভোজের আয়োজন হবে।

মইরাংএর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নিভৃত নির্জ্জনতায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আমি কয়েকদিন অবস্থান করেছিলাম। মইরাং মণিপুরের একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বিশাল রাজপুরী এখনো বর্ত্তমান। এই স্থানের সঙ্গে রাজকুমারী থইবি আর তার প্রেমাস্পদ খাম্বার বিষাদ-মাখা কাহিনী বিজড়িত। এরা উভয়েই ছিলেন মইরাংএর অধিবাসী। এখানকার 'থাংজিং'এর মন্দিরে এই প্রণয়ি-যুগলের পোষাক-পরিচ্ছদ আজও সযত্নে রক্ষিত। আমাদের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী যেমন সত্য, মণিপুরীদের নিকট খাম্বা ও থইবির কাহিনী তেমনি সত্য। মণিপুরের চারণদল আজও গ্রামে গ্রামে 'পেনা' নামক বাদ্যযন্ত্র সংযোগে এদের সকরুণ বিয়োগান্ত কাহিনী গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়।

খাম্বা ও থইবি

মইরাং-এর রাজা চিংখু তেলহেইবা ছিলেন নিঃসন্তান। তার ভাই যুবরাজ চিংখু আখুবার থইবি লাইমা নামে ছিল একটি পরমাসুন্দরী কন্যা। খুমাল রাজপুত্র হরামহলের অত্যাচারে তার ভাই হোরামইয়েমা পালিয়ে এলেন মইরাংএ। সেখানে এসে তিনি সে-দেশের দুটি মেয়ের পাণিগ্রহণ করলেন; তাঁর প্রথমা পত্নীর গর্ভ-জাত পুত্রের নাম পারেনকইবা। পারেনকইবার বড় ছেলে পুরেনবার ঔরসে জন্মাল প্রথমে একটি মেয়ে, তারপর একটি ছেলে। মেয়েটির নাম খামনু আর ছেলেটির নাম খাম্বা।

একদিন রাজা চিংখু তেলহেইবা নিবিড় জঙ্গলে গেছেন শিকার করতে। এমন সময় পাঁচ-পাঁচটা বাঘ এসে তাকে তাড়া করলে, সঙ্গের লোকজন সব গেল পালিয়ে। শুধু পুরেনবা এই বিপদের সময় রাজাকে পরিত্যাগ করলেন না। তীক্ষ্ণধার বর্শার আঘাতে সবকয়টা বাঘ মেরে তিনি রাজার প্রাণ রক্ষা করলেন। রাজা তার ওপর ভারি সন্তুষ্ট হলেন। এখন তাকে খুশী করা চাই তো! কি তাকে দেওয়া যায়। তার নিজের তো কোনো মেয়ে ছিল না। তাই তিনি নিজের পাটরাণীকেই একেবারে স্বত্বত্যাগ করে তাকে দিয়ে দিলেন আর রাজসভায় এনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন উচ্চ রাজপদে। কিন্তু পুরেনবার অদৃষ্টে এ রাজসমাদর বেশী দিন সইল না। দিনকতক পরেই তিনি মারা গেলেন, তার পত্নী চিতায় আরোহণ করে অনুমৃতা হলেন। বাপ-মা মারা যাবার পর ছেলেমেয়ে দুটি একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। সংসার চালানোর ষোলো আনা দায়িত্ব পড়ল খামনুর ঘাড়ে। খাম্বাকে বাড়ীতে রেখে সে চলে যেত দূর গ্রামান্তরে ধান ভানতে। একদিন খামনু মাইরাংএর হাটে গেছে বেসাতি করতে, রাজকুমারী থইবিও এসেছেন সেদিন হাটে সওদা করতে। রাজকুমারী খামনুকে দেখে বিস্মিত হলেন,

কেন না, এ মুখখানা তো তার পরিচিত নয়। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তাদের সকল কথা জেনে নিলেন। জন্মদুঃখী ভাইবোনের করুণ কাহিনী শুনে করুণায় তাঁর মন আর্দ্র হয়ে এল। তিনি তাকে খাবার কিনে দিলেন, গয়নাগাঁটিও দিলেন প্রচুর। দিনকতক পরে থইবির সঙ্গে খামন্থুর আবার দেখা। রাজকুমারী তাকে তার সঙ্গে লোগতাক হ্রদে মৎস্য-শিকারে যেতে অনুরোধ করলেন। রাজা যখন শুনলেন যে, রাজকন্যা আর তার সহচরীরা সব লোগতাকে যাবে মৎস্য-শিকার করতে, তখন তিনি রাজ্য-ময় ঢেঁটরা পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন, কোনো পুরুষ যেন সেদিন লোগতাকের চতুঃসীমানার মধ্যে না যায়। খাম্বাকে একথা বলে খামন্থু তাকে একলা বাড়ীতে রেখে চলে গেল লোগতাকে। কিছুক্ষণ পরে খাম্বা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল যেন 'থাংজিং' তাকে লোগতাকে যাবার জন্যে আদেশ করছেন। ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে ওঠে সে লোগতাকের দিকে রওনা হ'ল। হ্রদের তীরে পৌছে দেখে, ঘাটে বাঁধা আছে একটি নৌকা। হ্রদের বুকে নৌকা বেয়ে সে চলতে লাগল। হঠাৎ উঠল সোঁ সোঁ করে প্রচণ্ড ঝড়; মেঘের ঘোমটায় পাহাড়ের মুখ গেল ঢেকে। ঝড়ের বেগে নৌকাখানা যদৃচ্ছাক্রমে চলতে লাগল। অবশেষে হ্রদতটে থইবি আর খামন্থু যেখানে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিল সে জায়গার নিকটে একটি ভাসমান দ্বীপে এসে আট্‌কা পড়ল। থইবি বিস্মিত হয়ে দেখেন তার সুমুখেই নৌকার ওপর বসে আছে এক অনিন্দ্যসুন্দর তরুণকান্তি যুবা। তখন ঝড় থেমে গেছে। পূর্ব্বদিকে শৈলচূড়ায় অরুণোদয়ের আভাস। নব অরুণরাগে অনুরঞ্জিত পূর্ব্বাচলের পুরোভাগে মূর্ত্তিমতী উষসীর মতো দাঁড়িয়ে অনবদ্যাঙ্গী থইবি। প্রথম দৃষ্টিতেই খাম্বা ও থইবির পরস্পরের প্রতি জন্মাল অনুরাগ। খামন্থুকে জিজ্ঞেস করে রাজকন্যা জানলেন যে, এই তরুণ-কিশোর তার ভাই। তখন তিনি তাকে বললেন, "তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু, তুমি শিগগির বাড়ী চলে যাও। নইলে তোমার বিপদ হবে। কোন্ সাহসে তুমি রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছ।" খাম্বা তার কথামত বাড়ী চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে রাজকন্যাও খামন্থুর সঙ্গে

তাদের কুটীরে এসে হাজির। সেখানে মাটিতে বিছানো একখানা লাল কাপড়ে বসে তাদের বাড়ীঘরের এত তারিফ করতে লাগলেন যেন তা রাজপ্রাসাদের চেয়েও সুন্দর। তারপর তাদের গৃহদেবতা খুমালপক্পার সাম্নে হাঁটু গেড়ে বসে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করতে লাগলেন "হে দয়াময় খুমালপক্পা! আমি এ বাড়ীতে চিরতরে থাকতে চাই, আর কিছুর জন্যে নয়, এ বাড়ীতে থাকলে আমি যে রোজই তোমাকে পূজো করতে পারবো।" তার প্রার্থনার রকম দেখে খাম্বা হো হো করে হেসে উঠল। রাজকুমারী বললেন "হেসো না, খুমাল-পক্পা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।" তারপর একটা বাটিতে সোনার চুড়ি খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রেখে রাজকন্যা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, আজীবন তিনি খাম্বাকে ভাল-বাসবেন। খামনুকে তিনি বোন বলে সম্বোধন করলেন।

খাম্বা ছিল অমিতবলশালী। কিছুদিন পরে রাজ-সরকারে মল্লদের দলে গিয়ে সে ভর্ত্তি হল। মহামল্ল কুস্তিগীর কঙ্গিয়াম্বা প্রথম থেকেই তাকে বিষ-নজরে দেখতে সুরু করলে। সামান্য দোষত্রুটি দেখলেই সে তাকে তম্বি করতে থাকে। একদিন খাম্বা মনের আনন্দে গান গাইছে, গানের কথার মাঝে মাঝে রাজকুমারী থইবির নামটা জুড়ে দিচ্ছে। কঙ্গিয়াম্বা ত রেগে অস্থির; জিজ্ঞেস করলে,—"এর মানে?" মৃদু হেসে চট্পট্ খাম্বা জবাব দিলে—"আরে, আমি টইবি বলে আমাদের গাঁয়ের একটি মেয়ের কথা বলছি, তার সঙ্গে আমার ভাব আছে কিনা।" এই নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হ'ল। খাম্বার নিকট কঙ্গিয়াম্বার হ'ল চূড়ান্ত অপমান। বাড়ীতে এসে সে ঝাল ঝাড়লে স্ত্রীর উপর। সে বেচারী যখন তার পা ধুইয়ে দেবার জন্যে জল নিয়ে হাজির হ'ল, তখন সে বাটির ওপর মারলে প্রচণ্ড এক লাথি। সবটুকু জল ছিট্কে পড়ে গেল।

দিনকতক পরে সুরু হ'ল 'লামচেল' (দৌড়), আর কুস্তি-প্রতিযোগিতা। ভিন্ন ভিন্ন দুই দলের নেতা খাম্বা আর কঙ্গিয়াম্বার মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হবামাত্রই খামনু খাম্বাকে উৎসাহ দিয়ে চেঁচাতে লাগল,—"জোরে, আরো জোরে ভাই! বাপের নাম রাখতে হবে।" প্রতিযোগিতায় খাম্বারই হল জিৎ। রাজা

তার ওপর এত খুশী হলেন যে একটি স্বর্ণখচিত জামা তাকে দিয়ে দিলেন; রাণী দিলেন তাকে মূল্যবান বেশভূষা আর পাত্রমিত্রেরা দিলেন প্রচুর উপঢৌকন। কুস্তি এবং অন্যান্য সব রকমের শারীরিক শক্তি-প্রতিযোগিতায় খাম্বাই হ'ল বিজয়ী বীর।

খাম্বার সুনাম আর প্রতিপত্তি দেখে কঙ্গিয়াম্বা হিংসেয় জ্বলতে লাগল। কিভাবে তার অনিষ্টাচরণ করা যায়, তাই হ'ল তার একমাত্র চিন্তা। এই সময় একদিন তার নজরে পড়ল, খুমাল নামক স্থানের মেয়েরা মইরাংএর নদীতে মাছ ধরছে। তা দেখে সে তাদের জিজ্ঞেস করলে,—"ওগো খুমালের মেয়েরা! তোমরা কেন মইরাংএর নদীতে মাছ ধরতে এসেছ? তোমাদের ইকপ আর ওয়াইথো নদীর জল কি শুকিয়ে গেছে?" তার কথার জবাবে তারা বললে, "নাগো তা নয়। ক'দিন ধরে একটা বুনো ষাঁড় এসে ওয়াইথো নদীর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে ভারি উৎপাত সুরু করেছে। এর মধ্যে সে একটি লোককে মেরেও ফেলেছে। তাই সেখানে মাছ ধরতে যেতে আমাদের সাহসে কুলোয় না।" একথা শুনে তার মাথায় একটা দুরভিসন্ধি এল। তখনি সে রাজার কাছে গিয়ে হাজির,—বললে, —"মহারাজ প্রভু থাংজিংএর প্রত্যাদেশ আমি শুনতে পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, 'বৎস তোমাদের কাছ থেকে মাছ-মাংস আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি; কিন্তু এ বছর ইকপ আর ওয়াইথো নদীতীরস্থ জঙ্গলে বিচরণশীল প্রচণ্ড ষণ্ডটির সুস্বাদু মাংসের জন্যে আমার রসনা দিয়ে জল পড়ছে।' আমার নোকর খাম্বাকে একথা বলেছিলাম, সে তো এই মুহূর্ত্তেই ষাঁড়টাকে হত্যা করতে রওনা হতে চায়।" রাজা খাম্বাকে ডাকিয়ে এনে একথা জিজ্ঞেস করলে, সে বেমালুম অস্বীকার করলে। তখন কঙ্গিয়াম্বা তাকে জাত তুলে, মিথ্যাবাদী ভীরু বলে গাল দিলে। শুনে খাম্বা অত্যন্ত অপমান বোধ করলে; রাজাকে প্রণাম করে বললে, —"মহারাজ! থাংজিংএর আশীর্ব্বাদে এখনি আমি ষাঁড়টাকে গিয়ে জ্যান্ত ধরে নিয়ে আসছি।" রাজা শুনে ভারি খুশী। শপথবাক্য উচ্চারণ করে বললেন, "যদি বাস্তবিকই তুমি তা পার তাহলে থইবিকে তোমার হাতেই আমি সঁপে দেব।"

রাজার শপথ শেষ হলে তাঁর প্রতিজ্ঞার নিদর্শন-স্বরূপ রাজ-অমাত্য থংলেন 'কংলার' (দরবার-গৃহের) দরজার মাথায় সাতটি চিহ্ন আঁকলেন। মইরাং থেকে চর গিয়ে খুমাল-রাজাকে এ সংবাদ দিলে। খুমাল-রাজা যখন শুনলেন যে, ষাঁড়টাকে যে মারবে সে হচ্ছে তাঁদেরই বংশের লোক, তখন গর্ব্বে তাঁর বুক ফুলে উঠল। তাঁর আদেশে নদীর পাড়ে তৈরি হল খুমাল-গোষ্ঠীর জন্য সাতশো আর মইরাং-গোষ্ঠীর জন্যে সাতশো মাচান।

পরদিন নদীতীরে বিরাট জনতা। খাম্বা ষাঁড়টার সঙ্গে লড়াই করতে রওনা হবে এমন সময় খামনু তাকে বললে,—"ভাই! এই মহাষণ্ডটি এক সময় ছিল আমাদের পিতার গো-শালার গো-স্বামী। তার কাছে গিয়ে কানে কানে আমাদের পিতৃনাম উচ্চারণ কোরো আর তাকে এই রেশমের রজ্জুটি দেখিয়ো।"

খাম্বা তখন ষাঁড়ের সন্ধানে ছোট একটি টিলার ওপরে গিয়ে উঠল। ষাঁড়টা তাকে দেখেই শিং উঁচিয়ে ছুটে এল। খাম্বা তখন তার শিংদুটি দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরল। তারপর একলাফে ষাঁড়টার ঘাড়ের ওপর চেপে বসল। আর সে তাকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিলে ছুট। জঙ্গলে ঢুকেই খাম্বা ষাঁড়টার কানে কানে চুপি চুপি তার বাপের নাম বললে আর তাকে সেই রেশমী রজ্জুটি দেখালে। ষাঁড়টার তখন মনে পড়ল তার প্রভুর নাম। দড়িটাকে দেখেই সে চিনতে পারলে এবং নিজেই শিং দিয়ে গলায় সেটাকে জড়িয়ে নিলে; তখন খাম্বা যেখানে খামনু আর থইবি দাঁড়িয়েছিল, ষাঁড়টাকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির। রাজা প্রীত হয়ে তাকে প্রচুর মণিমাণিক্য পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নানা উপঢৌকন দিলেন। পরদিন থাংজিংএর প্রীত্যর্থে খাম্বা ষাঁড়টাকে বধ করলে। স্থরু হ'ল থাংজিংএর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিপুল আয়োজন। রাজা আর যুবরাজ* মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তীর নিক্ষেপ করলেন। খাম্বা যখন যুবরাজের নিক্ষিপ্ত তীরগুলো কুড়িয়ে আনবার জন্যে দ্রুতবেগে ছুট দিয়েছে তখন তিনি তার গায়ে তাঁরই সোনার কাজ করা কোর্ত্তাটি দেখে বিস্মিত হলেন, থইবি যে খাম্বাকে সেটি দিয়ে দিয়েছে যুবরাজ তা তো আর

* মণিপুরে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাই যুবরাজের পদে অভিষিক্ত হন।

জানতেন না। তিনি মনে করলেন, খাম্বা সেটা চুরি করেছে, তাই তিনি তার ওপর বেজায় চটে গেলেন। খাম্বা যখন তাঁর তীরে কুড়িয়ে নিয়ে এল, তখন তিনি রাগে তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। কঙ্গিয়াম্বা দেখলে যুবরাজের প্রিয়পাত্র হবার এই স্থযোগ। চট্‌পট্‌ ছোঁ মেরে সে খাম্বার হাত থেকে তীরগুলো কেড়ে নিয়ে যুবরাজের পায়ের কাছে রাখলে। যুবরাজ তো মহাখুশী, বললেন—"তোমার হাতেই আমি আমার মেয়ে থইবিকে সম্প্রদান করব। বিয়ের উপহারও দিন পাঁচেকের মধ্যেই তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।" তখন খাম্বার পিতৃবন্ধু নংথলবা বল্লেন, "যুবরাজ! আপনার মেয়ে কি এমনি একটা ওঁচা জিনিষ যে, যখন যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দেবেন। খাম্বা যেদিন ষাঁড়টাকে হত্যা করলে সেদিন মহারাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে থইবিকে তিনি খাম্বারই হস্তে সমর্পণ করবেন।" যুবরাজ বললেন,—"তা আমি জানিনে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যাকে বলে হাতীকা দাঁত মরদকা বাত। যা বলেছি বলেইছি—এর আর নড়চড় নেই। আমার মেয়ে আমি কঙ্গিয়াম্বাকেই দেব।" থইবির কানে যখন একথা গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি তাড়াতাড়ি খাম্বার কাছে গিয়ে তাকে কতকগুলো ফল এনে দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। খাম্বা তার নির্দ্দেশমত কতকগুলো ফল এনে তাঁর হাতে দিলে। যুবরাজ মৃগয়া থেকে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসেই কোনো রকম টক ফল আছে কিনা জানতে চাইলে থইবি বললেন,—"বাবা তোমার জন্যে আমি কতকগুলো ফল জোগাড় করে রেখেছি।" রাজা ফলগুলো খেয়ে খুব তৃপ্ত হলেন, বললেন—"এ ফলের নাম কি মা?" থইবি বললেন,—"বাবা এগুলোর নাম চা-কাও আর ওগুলোর নাম মাকাও।" রাজা বললেন—"ভারি অদ্ভুত নাম তো। এগুলো আবার কোথা থেকে আনলে।" থইবি জবাব দিলেন,—"বাবা এগুলো কি ফল তুমি জানো না, ভারি আশ্চর্য্য তো! তোমার জামাই খাম্বা যে তোমায় ভেট পাঠিয়েছে।" এখন যুবরাজ পড়লেন মহা ফাঁপরে। তিনি খাম্বার দেওয়া ফল খেয়েছেন, এখন তো আর তাকে জামাই বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। রেগে অস্থির হয়ে তিনি কি যে করবেন তাই স্থির করতে পারলেন না।

হাতের কাছে ছিল রূপোর হুঁকোটা, তাই তুলে নিয়ে তিনি থইবিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। সঙ্গে সঙ্গেই থইবি মূর্চ্ছা গেলেন। স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, লাইমারেন আর পানথইবি নামে উপদেবতা দুটি তার ওপর এসে ভর করেছে। তারা তো সবাই তাঁকে ঘিরে মড়াকান্না জুড়ে দিলে। এতে যুবরাজ একদম ভড়কে গেলেন, তখন তিনি রাজকুমারীকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন,—"ওঠো মা, শিগ্‌গিরই খাম্বার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমায় স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেব।" একথা শুনেই থইবির মূর্চ্ছা গেল ভেঙে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

দিনকতক পরে একদিন রাস্তায় হঠাৎ খাম্বার সঙ্গে কঙ্গিয়াম্বার দেখা। কঙ্গিয়াম্বা বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তাকে শুধোলে,—"কি হে, এখনো কি তুমি থইবিকে বিয়ে করবার আশা পোষণ করছ?" খাম্বা জবাব দিলে,—"নিশ্চয় জেনো কঙ্গিয়াম্বা! প্রাণ থাকতে থইবির আশা আমি ছাড়বো না।" এমনিভাবে স্থরু হ'ল কথা কাটাকাটি তারপর প্রচণ্ড ঝগড়া। খাম্বা কঙ্গিয়াম্বাকে এক ঝট্‌কায় মাটিতে ফেলে তার পেটের ওপর আচ্ছা করে জেঁকে বসে এমনি জোরে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরল যে, কঙ্গিয়াম্বার লোকজনরা ছাড়িয়ে না দিলে সে যাত্রা হয়তো তাকে মেরেই ফেলত। সবাই মিলে তখন তাকে বেদম প্রহার করতে লাগল, তার কাপড়-চোপড় তারা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। তারপর এমনি কষে তাকে বাঁধলে যে, তার আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতাটি পর্য্যন্ত রইল না। এই সময় রাজহস্তীর ওপর চড়ে যুবরাজ সেখানে এসে হাজির। খাম্বাকে দেখেই তাঁর মনে হিংস্র প্রবৃত্তি জেগে উঠল। দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে তাকে হাতীর পায়ের সঙ্গে বাঁধবার হুকুম দিলেন। তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হ'লে হাতীটাকে অঙ্কুশ দিয়ে তাড়না করা হ'ল। কিন্তু প্রভু থাংজিংএর কি মহিমা! হাতীটা যে নড়তেই চায় না। এই না দেখে কঙ্গিয়াম্বা বর্শা দিয়ে তাকে সজোরে খোঁচা মারলে। হাতীটা তখন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু খাম্বাকে সে প্রাণে মারলে না। এমনিভাবে হস্তীপদে হস্তপদ-আবদ্ধ অবস্থায় খাম্বার সারা রাত্রি কাটল। সকলে তাকে নির্জ্জীবের মতো দেখে সবাই বলাবলি

করতে লাগল, খাম্বা মরে গেছে। তখন হাতীর শরীর থেকে তার বাঁধন খুলে তাকে অনতিদূরে জঙ্গলের ভেতর ফেলে দিয়ে সবাই যে যার ঘরে চলে গেল। এদিকে রাত্রি-শেষে দেবী পানথইবি থইবিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—"বাছা তোমার বাবার হুকুমে তার লোকজনরা যে তোমার খাম্বাকে সারা রাত হাতীর পায়ে বেঁধে রেখেছিল, এখন সে জঙ্গলের ভেতর আধমরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।" এই দুঃস্বপ্ন দেখে থইবি ধড়মড় করে জেগে উঠলেন, তারপর একটা ছুরি নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে দেখেন সেখানে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে খাম্বা। ছুরি দিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে তিনি তার শুশ্রূষা আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে খাম্বা সম্বিৎ ফিরে পেয়েই দেখে, মাথার কাছে বসে আছে তার প্রিয়তমা থইবি।

খাম্বার ওপর এ অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনে তার একান্ত হিতৈষী নংথলবা গেলেন ক্ষেপে। যুবরাজকে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা প্রভু! জিজ্ঞেস করি, মানুষের মরণ-বাঁচনের কর্ত্তা কি ভগবান, না আপনি স্বয়ং।" যুবরাজ গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন—"আমি, আমি হে! বুঝলে নংথলবা! আমিই ইচ্ছা করলে মানুষকে রাখতে পারি, আবার তাকে মারতেও পারি।" নংথলবা তখন মহারাজের কাছে গিয়ে নালিশ জানালেন। তাঁর অভিযোগ শুনে মহারাজ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। যারা খাম্বার ওপর অত্যাচার করেছিল তাদের প্রত্যেককে তিনি কঠোর শাস্তি দিলেন। যুবরাজ স্বয়ং নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। কিন্তু সাজা পেলে কি হবে? স্বভাব যায় না ম'লে। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই যুবরাজ আবার স্ব-মূর্ত্তি ধারণ করলেন। তার সকল রাগ থইবির ওপর—কেননা, সেই সকল অনিষ্টের মূল। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে বললেন—"তোর মতো অবাধ্য সন্তানের বাপ হওয়ার চাইতে নিঃসন্তান থাকা ছিল ঢের ভালো। এ জন্মে তোর মুখ আর আমি দেখতে চাইনে। আজই তোকে আমি নির্ব্বাসনে পাঠাব।" নফরকে ডেকে যুবরাজ হুকুম দিলেন—"যা, এখুনি এই আপদটাকে কুবোতে নিয়ে

বিক্রী করে ফেল্‌গে।” যুবরাজের আদেশে দাসী এসে তক্ষুনি রাজকন্যার অঙ্গ থেকে মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কার সব খুলে নিয়ে তাকে একখানা মলিন ছিন্ন বাস পরিয়ে দিলে। ছিন্নবসনপরিহিতা থইবি খাম্বার বাড়ীতে ছুটে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তাকে বললেন—“ওগো! বাবা যে আজ আপদ বিদায় করছেন। আমি দূরে সরে না গেলে তোমারও যে আর বাঁচোয়া নেই। রাজকন্যা আজ ক্রীতদাসী হ’তে চলল কুবোতে। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে যেয়ো না, আমার মন বলছে নিশ্চয়ই আবার আমাদের মিলন হবে।”

বাড়ীতে ফিরে এসে বাপ-মাকে প্রণাম করে রাজকন্যা ভিখারিণীর বেশে রাজপুরী ছেড়ে চললেন। এ করুণ দৃশ্যে রাজ্যময় কান্নার রোল উঠল। রাজধানীর সীমানা ছাড়িয়ে এসে দেখেন হন্‌ হন্‌ করে ছুটে আসছে খাম্বা। পথের পাশে একটা গাছতলায় রাজকন্যা বসলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে খাম্বাও তাঁর পাশে এসে উপবেশন করলে। দু’জনেরই চোখে অবিরাম অশ্রুধারা। পাহাড়ে-পথে চলবার সুবিধার জন্যে খাম্বা একটি যষ্টি তাঁকে দিলে। কিন্তু রাজকন্যা সেটি রাস্তার পাশে মাটিতে পুঁতে খাম্বাকে বললেন,—“যদি তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা অটুট থাকে তাহলে এই শুষ্ক যষ্টি একদিন পত্রপুষ্পে মুঞ্জরিত হয়ে উঠবে।” প্রচুর অশ্রু বিসর্জন করে একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যুবরাজের অনুচরটি রাজকন্যাকে কুবোতে নিয়ে গিয়ে তামুরকপার নিকট বিক্রী করলে। সেখানে গিয়ে রাজকন্যা হলেন মেছুনী আর কাঠকুড়োনী। বাজারে গিয়ে তাকে মাছ বেচতে হয়, জঙ্গলের ভেতর থেকে কুড়িয়ে আনতে হয় কাঠের বোঝা। সারাদিন কাজকর্ম্মে তার এক রকম কেটে যায়। কিন্তু রাত্রি হলেই খাম্বার কথা, নিজের বাড়ীঘরের কথা মনে পড়ে তার চোখে অশ্রুর বন্যা নামে।

এদিকে কিছুদিন পরে যুবরাজের মন নরম হয়ে এল। হাজার হোক নিজের মেয়ে তো! তাই তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি লোক পাঠালেন। যে-পথ দিয়ে একদিন রাজকন্যা নির্ব্বাসনে গিয়েছিলেন সে-পথ দিয়ে আবার রাজ্যে

ফিরে আসছেন। রাজপুরীর কাছে এসে দেখেন তার নিজের হাতে পোঁতা সেই যষ্টিটি পত্রপল্লবপুষ্প-সমাচ্ছন্ন হয়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। এদিকে কঙ্গিয়াম্বা কিন্তু রাজকুমারীর আগমনবার্ত্তা জেনে আগেভাগেই এসে পথের পাশে ঘুপটি মেরে বসেছিল। তার মতলবটা খুব সুবিধার নয়। পথিমধ্যেই দুজনের দেখা হ'ল। কঙ্গিয়াম্বার স্ফূর্ত্তি দেখে কে ? মহা উল্লসিত হয়ে পথের ওপরেই তার সঙ্গের লাল কাপড়টি বিছিয়ে দিয়ে থইবিকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে। থইবি তার অনুরোধ রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে একটি ছোট দণ্ড রেখে কাছে থেকেও বেশ একটুখানি দূরত্বের সৃষ্টি ক'রে নিলেন। ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা বেশ জমে উঠল। কঙ্গিয়াম্বা তো আহ্লাদে ডগমগ। আকাশের চাঁদ যে বাস্তবিকই তার নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। থইবি কাঙ্গিয়াম্বাকে কিছু ফল এনে দিতে অনুরোধ করলেন। ফল তো সামান্য জিনিষ, —থইবির হুকুম পেলে কঙ্গিয়াম্বা যে মাথায় করে গোটা গন্ধমাদনটাই নিয়ে আসতে পারে ! তাড়াতাড়ি বাজার থেকে এক ঝুড়ি ফল নিয়ে এসে সে রাজকন্যার সাম্‌নে রাখলে। আব্দারের সুরে থইবি তখন বললেন যে, তিনি তার টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরীতে যেতে চান, অবশ্য তার বিনিময়ে তিনি তাকে তার বাবার পাঠানো ডুলিটা ব্যবহার করতে দেবেন। তাই সই,—কঙ্গিয়াম্বা তাতে অরাজী নয়। এদিকে থইবি চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে আর কঙ্গিয়াম্বা আসছে পেছনে পেছনে ডুলিতে ক'রে। রাজধানীর কাছে এসেই রাজকন্যা প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন সরাসরি খাম্বার বাড়ীর পানে। কঙ্গিয়াম্বা হতভম্ব হয়ে পথের পানে তাকিয়ে রইল।

পরদিন এক বৃদ্ধা রাজার কাছে এসে হাজির। বললে,—"মহারাজ ! আমাদের বাড়ীর কাছে জঙ্গলের ভেতর একটা বাঘ এসে ভারি উৎপাত জুড়ে দিয়েছে। আপনি এর একটা বিহিত করুন।" রাজা বললেন—"বেশ কথা ! যে এই বাঘ মারতে পারবে সেই হবে থইবির স্বামী, তার হাতেই থইবিকে সঁপে দেওয়া যাবে।"

পরদিন জঙ্গলের আশেপাশে মাচান বাঁধা হল ; পাত্রমিত্র সহ রাজা এসে মাচানে আসন গ্রহণ করলেন। ধবধবে শাদা কাপড় পরা অসংখ্য লোক সেখানে এসে জমায়েৎ হল। দূরের থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একখানা অনন্তপ্রসারিত শ্বেতবস্ত্র মাটির ওপরে বিছানো। হঠাৎ অনতিদূরস্থ জঙ্গলের ভেতর বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল। খাম্বা আর কঙ্গিয়াম্বা দু'জনেই জঙ্গলের ভেতর ঢুকে বাঘটাকে দেখতে পেলে। পর পর দুজনেই তার ওপর দুটি তীর নিক্ষেপ করলে। কিন্তু দুটি তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। হঠাৎ বাঘটা কঙ্গিয়াম্বার ওপর প্রচণ্ড বিক্রমে লাফিয়ে পড়ে নখদন্তের আঘাতে তার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বাঘটা যখন কঙ্গিয়াম্বাকে নিয়ে পড়েছে তখন খাম্বা প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়লে তার ওপর আরেকটা তীর। সেই তীরের আঘাতে ঘায়েল হয়ে বাঘটা গুড়িসুড়ি মেরে নিবিড়তর জঙ্গলের ভেতর গিয়ে ঢুকতে লাগল। খাম্বা তার অনুসরণ করলে, আবার সে তার ব্যাদিত মুখগহ্বরের ভিতর তীর ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে পড়ে গেল ; আর উঠল না। খাম্বা তখন সেটাকে জঙ্গলের ভেতর থেকে টেনে মাচার ওপর উপবিষ্ট রাজার কাছে নিয়ে এল। খাম্বার এই বীরত্ব দেখে রাজার আর আনন্দ ধরে না। তিনি তাকে অনেক মহার্ঘ্য জিনিষ উপহার দিলেন। তাঁর অনুগ্রহে নিঃসম্বল খাম্বা হল একটা লবণ-কূপের মালিক। মহারাজা রাজ্যময় জানিয়ে দিলেন যে এখন থেকে সবাই যেন তাকে পুখ্‌রামবা বলে ডাকে।

তারপর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে খাম্বা আর থইবির বিয়ে হ'ল। বীরের কণ্ঠেই রাজকন্যা বরমাল্য দিলেন। কিছু দিন পরে খামনুরও বিয়ে হ'ল। সে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল।

এমনিভাবে দিন যায়। কেন জানি হঠাৎ একদিন খাম্বার মনে থইবির চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হল। মনে হল, সে তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। তার ভালোবাসা হয়তো শুধুই ভান ! তার প্রতি থইবির একনিষ্ঠতা আছে কিনা তা

যাচাই করে নেবার জন্যে সে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটলে। একদিন গভীর রাত্রে সে বাইরে থেকে ঘরের বেড়ার ভেতর দিয়ে একটা লাঠি ঢুকিয়ে দিলে।* থইবি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—"আমি সতী মেয়ে, কে আমায় দিক করছে।" এই না বলে রাগের মাথায় তাকের ওপর থেকে খাম্বার বর্শাটা পেড়ে এনে দেয়ালের ভেতর দিয়ে তারই বুকে বসিয়ে দিলেন। খাম্বা তখন আর্ত্তকণ্ঠে 'থইবি' 'থইবি' বলে চীৎকার করে উঠল। চমকে উঠলেন রাজকন্যা। এ যে তারই প্রিয়তমের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! পাগলের মত বাইরে ছুটে এসে দেখেন মাটিতে পড়ে আছে খাম্বা, তার শরীর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। ক্ষিপ্রহস্তে প্রিয়তমের দেহ থেকে বর্শা উৎপাটিত করে রাজকন্যা নিজের বুকে আমূল বসিয়ে দিলেন।

একই সঙ্গে প্রণয়িযুগলের মৃত্যু হল,—একই চিতায় তাদের দেহ হ'ল ভস্মীভূত। তারা তো আর সাধারণ মানুষ ছিলেন না,—দেবতার অংশে তাঁদের জন্ম। সাধারণ মানুষের মত পুত্রকন্যা নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে তাঁরা আসেন নি; তাঁরা এসেছিলেন নিজেদের জীবন দিয়ে সংসারে প্রেমের আদর্শ প্রচার করবার জন্যে।

* মণিপুরে অবিশ্বাসিনী স্ত্রীলোকদের গৃহত্যাগিনী করবার এটিই নাকি প্রচলিত সঙ্কেত।

মণিপুরী নৃত্য-উৎসবের চিত্র

মণিপুরে অবস্থান-কালে মণিপুরীদের কয়েকটি নৃত্য-উৎসবে উপস্থিত থাকবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। সে উৎসব-রজনীগুলোর স্মৃতি এ জীবনে ভুলবার নয়।

মণিপুরী নৃত্যের খ্যাতি আজ শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলার বাইরেও প্রচারিত। এই নৃত্যকলার অন্তর্নিহিত অফুরন্ত রস-সম্পদ সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়ে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলারসিক রবীন্দ্রনাথের চোখে। আগরতলায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বড়ঠাকুরের পরিবারে তাঁর কন্যাদের নৃত্যকলা দেখে মুগ্ধ হন। ১৩৪৩ সনে আমাকে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, ১৩২৬ সনে যখন তিনি শ্রীহট্টে যান তখন উক্ত শহরের উপকণ্ঠস্থ একটি পল্লীর (মাছিমপুর) মণিপুরী মেয়েদের রাস-নৃত্য—দেখবার পর থেকেই নাকি শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প তাঁর মনে জাগে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মণিপুরী নাচ শেখাবার উদ্দেশ্যে কবিগুরু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নবকুমার ঠাকুরকে এবং মণিপুর রাজপরিবারের বুদ্ধিমন্ত সিংকে শান্তিনিকেতনে আনিয়াছিলেন। তা ছাড়া শিলচর থেকে ১৩৪১ সনে রাজকুমার সেনারিস, মহিম সিং এবং সিলেট থেকে নীলেশ্বর নামে একজন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

মণিপুরী তথা ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে ১৯২৭ ইংরাজীর ২৪শে জানুয়ারী তারিখটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঐ দিন নটীর পূজা অভিনীত হয়। নৃত্যকলা যে দর্শকদের মনে কি অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সঞ্চার করতে পারে, শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলাল বসু মহাশয়ের কন্যা গৌরী দেবীর নৃত্যাভিনয়ে তা প্রমাণিত হয়। মণিপুরী নৃত্যকেই ভিত্তি করে নটীর পূজার নৃত্য-পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কবিগুরুর পরবর্ত্তী কালের ঋতুরঙ্গ, শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যেও মণিপুরী নৃত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা বাদ দিয়ে আপাততঃ নৃত্য-উৎসব সম্বন্ধে আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

উৎসব-রজনীতে সুশোভিত নৃত্যমণ্ডপে ঢোক্‌বামাত্র মণিপুরীদের সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় পেয়ে চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল। ভিতরকার নবনির্ম্মিত বেষ্টনীটি কাগজ-কাটা ফুল-লতা-পাতা দিয়ে ঘেরা, ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত একটি ফোয়ারার মুখ দিয়ে স্ফটিকের টুক্‌রোর মত স্বচ্ছ, শুভ্র জলকণা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। দেবালয়ের দোর-গোড়ায় একটি জলচৌকিতে সাজানো গুটিকতক আন্‌কোরা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে তৈজসপত্র। মেঝেয় পাতা একটি শপে আসনপিঁড়ি হয়ে পাশাপাশি উপবিষ্ট তিনটি আধাবয়সী মহিলা যাই তালে তালে মন্দিরা বাজিয়ে গান ধরলেন অমনি বিচিত্রবেশা সালঙ্কারা নর্ত্তকীরা বেষ্টনীটির প্রবেশ-পথের মুখে জোড় বেঁধে সাত-আট সারিতে বিভক্ত হয়ে দণ্ডায়মান হ'ল। তাদের মাথার চুল অবিকল থাম্‌তি নামক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আদিম জাতির বিবাহিতা মেয়েদের ঢঙে চূড়া-আকারে বাঁধা। সেই উঁচু খোঁপার উপরকার কালো কাপড়ের ঢাক্‌নিগুলোতে নানান রজত-অলঙ্কার গোঁজা, মুখের উপর জালের মত পাতলা বসনের আবরণ (মাইখুম)। সর্ব্বাঙ্গ নানা আভরণে ভূষিত। গলায় কয়েক ছড়া স্বর্ণহার, কানে ইয়ারিং, বাহুতে বাজুবন্ধ, মণিবন্ধে কয়েক স্যুট সোনার চুড়ি। গায়ে লাল, কালো ইত্যাদি হরেক রঙের মখমলের আঁটসাট জ্যাকেট। এক একটি ধপধপে শাদা কাপড় বক্ষের উপর থেকে কটিতট অবধি খুব আঁট ক'রে জড়ানো। কেশচূড়াগ্র থেকে প্রলম্বিত কয়েক ছড়া পুঁতির মালা বক্ষাবরণ-বস্ত্রটিতে তির্য্যক্ ভাবে গাঁথা। পরনের ঘন সবুজ এবং রগরগে লাল মখমলের ঝলমলে বসনগুলোর (পলয়) জমির মাঝখানে অজস্র চুমকি এবং নিম্নপ্রান্তে পিতলের তবক-মোড়া এক একটি গোলাকার আরশি সমান্তরভাবে বসানো। পলয়ের ওপরে পরিহিত হাঁটু পর্য্যন্ত ফিন্‌ফিনে শাদা ঘাঘরাসমূহের নাম 'পছুয়াল'। পছুয়ালগুলো লম্বালম্বি সারি সারি জরীতে একেবারে ঠাস-বোনা। 'পলয়' এবং 'পছুয়াল', একটি মখমলের কোমর-বন্ধের সাহায্যে কটিতে সম্বদ্ধ। বাঁ-কাঁধের উপর থেকে ঝোলানো, নিম্নভাগে

সোনালী ও রূপালী জরীর নক্সা-কাটা গোল, চৌকা এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাচে খচিত একটি মখমলের ফালি প্রত্যেকেরই ডান উরুর ওপরে দোদুল্যমান। এগুলোর উপরিভাগ সরু কিন্তু নিম্নাংশ বেশ চওড়া।

সঙ্গীতকারিণীদের গান সমাপন হবার পর লৈছাবী অর্থাৎ কুমারীরা সমতালে পদক্ষেপ করতে করতে হাতে হাত ধরে গান গাইতে গাইতে বেষ্টনীটির ভিতরে প্রবেশ করলে। তার পর পরস্পরের হাত ছেড়ে দিয়ে আঙুল দ্বারা নানা আকারের মুদ্রা সৃজন ক'রে লঘু ললিতনৃত্যে চক্রাকারে বেষ্টনীটি পরিক্রমা সুরু করলে। তাদের দোলায়মান বসনে বসানো চুম্‌কি এবং আরশি এবং জরীতে উজ্জ্বল দীপালোক প্রতিফলিত হয়ে ঝক্‌মক্ করতে লাগল। দর্শকমণ্ডলীর বিস্মিত, বিমুগ্ধ দৃষ্টির সাম্‌নে আচম্‌কা যেন এক অপরূপ রূপলোকের সৃষ্টি হ'ল! বস্তুতঃ, অলোকসুন্দর এই শোভন, সংযত এবং সুরুচিপূর্ণ নৃত্যকলা। নৃত্যকারিণীদের সুন্দর গতিভঙ্গী এবং পাঁচ আঙুলের খেলা দেখে বিমোহিত না-হয়ে থাকা যায় না। অবশেষে যখন তারা সুকুমার বাহুগুলি নৃত্যচ্ছন্দে লীলায়িত ক'রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমার পানে ফুলদল ছুঁড়ে দিতে লাগল তখন মনে হ'ল যুগান্তরে বৃন্দাবনে শ্রীমতীর সখীরা এম্‌নিধারাই বুঝি উৎসবানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠত।

মণিপুরীদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর নাচের প্রচলন আছে যা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। বিবাহিতা রমণীরাও তাদের আটপৌরে কাপড়-চোপড় পরে তাতে যোগ দিয়ে থাকেন। ঐ ধরণের নাচ দেখবার সুযোগও একদা আমার হয়েছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কয়েকটি পূর্ণযৌবনা নারী জনকতক অনূঢ়া তরুণী এবং বালিকা-সহ নাচঘরে এসে আবৃতিটির ভিতরে বৃত্তাকারে দাঁড়ালেন। বিবাহিতা রমণীদের মাথার পেছন দিকে ফাঁপানো কবরী, মুখে অলকাতিলক। পরনে, বুকের কাছে গেরো-বাঁধা পাঁশুটে আশমানী, সবুজ এবং খয়ের রঙের আঁজি-কাটা চওড়া ফুলপাড় সুতী কিংবা চিক্কণ রেশমী বস্ত্র (ফানেক)। শাদা উত্তরীয় (ইনাফি) দ্বারা দেহের উত্তরার্দ্ধ আচ্ছাদিত এবং মস্তক অবগুণ্ঠিত। বিবাহিতা মণিপুরী

নারীদের মাথায় ঘোমটা দেওয়ার দস্তুর নেই, কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল।

বয়স্থা কুমারীদের মাথার সামনের দিকের চুলগুলো খুব ছোট ক'রে অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে ছাঁটা এবং কপালের ওপর আঁচড়ানো, দুই পার্শ্বে দুই গোছা আগা-ছাঁটা অলক কর্ণমূল বেষ্টন ক'রে লম্বমান। পশ্চাৎ দিকে স্তূপাকার খোলা চুল পিঠে ছড়ানো, নাকে চন্দনের তিলক, গায়ে অত্যন্ত খাটো হাতাযুক্ত নীল কালো এবং সবুজ সাটিনের ঢিলা জামা। পরিধানে কটিদেশে গ্রন্থিবদ্ধ, পাটল, পীত, জরদা এবং ফিকে লাল জমির 'পরে চওড়ার দিকে কালো ডোরা-কাটা নক্সা-পেড়ে 'ফানেক'। সকলেরই উদরের নিম্নাংশ অনাচ্ছাদিত এবং গায়ে একটি একটি মিহি ওড়্না জড়ানো, ওড়্নার সূক্ষ্ম আবরণ বিদীর্ণ করে তাদের মর্ম্মর-মসৃণ সুগোল বাহুগুলির পীত-গৌর আভা যেন ফুটে বেরুচ্ছে। ছোট ছোট বালিকাদের মাথার মাঝখানে সিঁতিকাটা। নর্ত্তকীদের প্রত্যেকেরই হাতে পাকানো লাল সুতোর স্তবক-লাগানো এক-এক জোড়া মন্দিরা। দলের মধ্যে একটি তরুণী বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে গানের একটি কলি গায়, শেষে আর সবাই তাদের নিটোল দেহকে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঈষৎ আনমিত ক'রে শুভ্র সুডোল বাহুগুলি শোভন ভঙ্গীতে সঞ্চালনপূর্ব্বক তালে তালে মন্দিরা বাজাতে বাজাতে ধুয়ো ধরে।

কখনও ধীরমন্থর গতিতে কখনও বা দ্রুততালে এম্‌নিতর নানা ছাঁদে, বহুক্ষণ পুরা মরসুমে নাচ চলবার পর সকলে হাঁটু গেড়ে বসল এবং মূল গায়েন মেয়েটি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে এক্‌লা নৃত্যগীত আরম্ভ করলে। স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল সেই নৃত্যশীলা তরুণীটির অনিন্দ্য দেহসৌষ্ঠব এবং অনুপম নৃত্য সেদিন সবাইকে বাস্তবিকই অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। মণিপুরী মেয়ে-পুরুষ মাত্রেই অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবপ্রবণ, অহেতুক কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয় তাদের একেবারে টইটুম্বুর। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার অন্তরের গভীর আনুরক্তিই যেন রূপায়িত হয়ে উঠেছিল ঐ নৃত্যপরা তরুণীটির অনুভাবে, তার

আকুল কণ্ঠস্বরে এবং তার অর্দ্ধনিমীলিত ভাবাবিষ্ট দুটি চোখের করুণ দৃষ্টিতে। এ-যেন যথার্থই 'সঙ্গীতে' ও 'ভঙ্গী'তে জীবন-দেবতার চরণমূলে আত্মনিবেদন। সার্থক এই নির্ম্মল নৃত্যকলা, দর্শকদের মনকে যা অতীন্দ্রিয় জগতের পানে টেনে নিয়ে যায়। রস-পিপাসু মণিপুরী জাতির মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রসের দিকটা বিশেষ ভাবেই অনুশীলিত হয়েছে; এদের নিজস্ব নৃত্যকলার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের লীলা মিশ্রিত হয়ে একে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত ক'রে তুলেছে। এদের নৃত্য-উৎসব মনকে টেনে নিয়ে যায় সেই কল্পলোকে যেখানে অনন্তকাল ধরে চল্‌ছে বৃন্দাবনের সেই চিরকিশোরের চিরন্তন লীলা। সৌন্দর্য্য-উপাসক ভক্তিপ্রাণ মণিপুরীদের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচার যে সার্থক হয়েছে, তাদের নৃত্য-উৎসব দেখলে সে-বিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় থাকে না।

মণিপুরের নাগা-সম্প্রদায়

ইম্‌ফলের 'সেনা কাইথেল' বাজার হচ্ছে নারীদের বাজার। এ বাজারে বেড়াতে গেলেই দেখতাম সার-বাঁধা চালাঘরগুলোর ভেতরে এবং বাইরে কাতারে কাতারে বিবাহিতা মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ পসরা নামিয়ে বসে গেছে। কোনো কোনো পসারিনী ডাবা হুঁকোয় ধূমপানে রত। সওদা করতে ইচ্ছুক নারীদল খুরোওয়ালা বেতের চুবড়ি মাথায় নিয়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছে। আর নজরে পড়ত এই বাজারে সমাগত মণিপুর-উপত্যকার চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়গুলোর অধিবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর নাগা-সম্প্রদায়। তন্মধ্যে কাঁধ থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লাল-শাদা বা লাল-নীল রঙের দীর্ঘ বস্ত্রে আবৃত-দেহ টাংখুলরা সবচেয়ে দলে পুরু। এদের পাখীর পালক, পশু-লোম, সরু বাঁশের টুক্‌রো, চাঁচা-ছোলা অর্দ্ধবৃত্তাকার মোষের শিং ইত্যাদি দ্বারা শোভিত শিরস্ত্রাণগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। 'কাবুই'দের লজ্জাসরমের বালাই কম। পুরুষদের পশ্চাৎদেশ সম্পূর্ণ অনাবৃত। খালি, সাম্‌নের দিকে এক একটি ঝোলা নেংটি ঘুন্‌সিতে আটকানো। মেয়েদের দেহের মধ্যভাগটুকু মাত্র এক একখানা নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। এক-হাট লোকের সামনে সম্পূর্ণ অনাবৃতবক্ষ কোন কোন কাবুই জননী সন্তানকে স্তন্যদানে রত। এক এক শ্রেণীর নাগাদের আবার এক এক রকমের চুলের ফ্যাশান। মারিংদের চুল কৃষ্ণচূড়া খোঁপার ধরণে ঝুঁটি-বাঁধা। চিরুদের বাবরি চুলে সিঁতি-কাটা, এদের শুধু কানের পাশ আর ঘাড়ের চুল কামানো আর বাবরিতে সরু বেতের ফালি জড়ানো। কোনো কোনো নাগার হাতে সুদীর্ঘ দ্বি-ধারী বর্শা। এরা মাও, টাংখুল, মারাম, কলিয়া, খইরাও, কাবুই, কুইরেং, চিরু, মারিং ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

অৰ্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেণ্ট মিঃ গ্রিম্‌উড ও তাঁর পত্নী যে-পথ দিয়ে শিলচর থেকে মণিপুরে গিয়েছিলেন, এবারকার যুদ্ধের কল্যাণে



টাংখুল নাগা

তা প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ রাস্তা দিয়ে যাবার কালেই মিসেস্ গ্রিম্‌উড টাংখুল, কাবুই প্রভৃতি মণিপুরের নাগাদের সংস্পর্শে আসেন।

শিলচর থেকে রওনা হয়ে চব্বিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে গ্রিন্‌উড দম্পতি

জিরি নদীর পাড়ে এসে পৌছেন। এখান থেকে মণিপুর রাজ্যের সীমানা আরন্ত। নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে তাঁদের ইম্‌ফল অভিমুখে অগ্রসর হতে



বর্শাধারী নাগা

হয়। মোটঘাট বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে টাংখুল, কাবুই প্রভৃতি নাগাদের তাঁরা নিযুক্ত করেন। এই উলঙ্গপ্রায় বর্ব্বরদের চেহারায় হিংস্রতার ছাপ মিসেস্ গ্রিম্‌উডের হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক করে।

মণিপুরের নাগাদের প্রায় সকলেরই নাক চ্যাপ্টা এবং চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ। এদের

মুখে গোঁফদাড়ি বিরল। দু-এক জনের যা-ও দু-এক গাছি গজায় মেয়েদের পছন্দসই নয় বলে তাও তারা টেনে তুলে ফেলে।

স্ত্রী-পুরুষ সকলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোঝা বহন করতে পারে। মণ দেড়েক বোঝা পিঠে ক'রে অবলীলাক্রমে পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করা নাগা মেয়েদের পক্ষেও কঠিন নয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যেন স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে উপ্‌চে পড়চে। সেই জন্যেই এদের জীবনে আনন্দের অভাব নেই। এদের সম্মিলিত উচ্চহাস্যে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত নিভৃত আবাসগুলো নিত্য মুখরিত। মেয়েরা হাস্যমুখে সংসারের সকল বোঝা বহন করে। এদের সমাজে নারীদের প্রতি কোন রকম অত্যাচারের কথা শোনা যায় না।

ভাত পচিয়ে এরা এক রকম মদ তৈয়ার করে, তাকে এরা বলে 'জু'। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে গ্রামগুলোতে প্রচুর পরিমাণে এই ধান্যেশ্বরীর সদ্ব্যবহার হয়। মদ যত কড়া হয় তাদের আনন্দের মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পায়। কুকুর পুড়িয়ে এই 'জু' দিয়ে ভিজিয়ে খাওয়া এদের নিকট অমৃতাস্বাদনবৎ। যেদিন এরা কুকুর খাবার সংকল্প করে তার আগের দিন সেটাকে একদম উপোসী রেখে দেয়। পরদিন হত্যা করবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাকে একেবারে পেট ঠেসে ভাত খাওয়ায়। তার পর সেটাকে আগুনে পুড়িয়ে ভাতে-মাংসে চট্‌কে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর উদ্যান-পরিচর্য্যার জন্যে মিসেস্ গ্রিম্‌উড কয়েকজন নাগাকে মালী হিসাবে নিযুক্ত করেন। এরা সারাক্ষণ প্রায় দিগম্বর অবস্থাতেই থাকত। মিসেস্ গ্রিম্‌উড তার এক কুমারী বান্ধবীর নিকট এ-কথা উল্লেখ করেন। সেই ভদ্রমহিলা এই নির্ল্লজ্জ বর্ব্বরতার কথা শুনে একেবারে আঁত্‌কে উঠেন এবং এদের সভ্য বানাবার উদ্দেশ্যে নয় জোড়া স্নানের পোষাক পাঠিয়ে দেন। মিসেস্ গ্রিম্‌উড পোষাকগুলো মালীদের দিয়ে দিলেন। তারা ত পেয়ে মহাখুশী। পরদিন বিকালে বাগানে বেড়াতে গিয়ে শ্রীমতী দেখেন দু'জন নাগাপুঙ্গব বাগানে কাজ করছে। একজন তার দেওয়া পোষাকে মস্ত বড় একটা

ফুটো ক'রে তার ভেতর দিয়ে মাথাটা গলিয়ে সেটা জামার মত গায়ে দিয়ে বসে আছে, দেহের নিম্নার্দ্ধ যথাপূর্ব্বং। কিন্তু চেহারায় বেশ একটা গর্ব্বের ভাব ফুটে বেরুচ্ছে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পোষাকটি দিয়ে মাথায় আচ্ছা ক'রে পাগড়ি জড়িয়ে



শিক্ষিত খ্রীষ্টান নাগা দম্পতি

নিয়েছে। এর পর অবশ্য মিসেস্ গ্রিম্উড বা তাঁর বান্ধবী এদের শ্লীলতা শেখাবার চেষ্টা আর করেন নি। এই সমস্ত জঙ্গলীরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে-রকম ছিল আজও অনেকটা তেমনি আছে। অবশ্য মিশনারীদের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মে যারা দীক্ষিত হয়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

শোনা যায় যে, দক্ষিণ অঞ্চলের টাংখুলরা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করত। মারিংরা তীরে এক প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষনির্য্যাস মাখিয়ে রাখে। এই বিষ এত তীব্র যে, নাগাদের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরে আহত প্রাণীসমূহ আধঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এদের ঢালগুলো মোষের চামড়া অথবা খুব ঠাস-বোনা চেরা বেতের তৈরি। তীক্ষ্ণধার বর্শাও এগুলোকে ভেদ করতে পারে না। এগুলো পাখীর পালক দ্বারা ভূষিত এবং ঠিক মাঝখানে একটি চওড়া লাল আঁজিকাটা চিতাবাঘের চামড়া অথবা কালো বস্ত্রখণ্ডের আবরণী দ্বারা আবৃত। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও এই পাহাড়ীদের অজ্ঞাত নয়।

কৃষিকার্য্যই এই আদিম জাতির লোকদের জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। কৃষিকর্ম্মে শাবল, কোদাল এবং দা-ই এদের প্রধান সম্বল, লাঙ্গলের ব্যবহার এদের জানা নেই। তাঁতে বস্ত্র-বয়ন তো নাগা-গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্ম। মৃৎপাত্রাদি নির্ম্মাণ এদের প্রধান কুটীর-শিল্প। অন্যান্য পাহাড়ী জাতির ন্যায় নাগা মেয়েরাও অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী। উদয়াস্ত এদের খাটুনির আর বিরাম নেই।

নাগারা জাত-শিকারী। এরা দলবদ্ধ হয়ে শিকারে বেরোয়। সকলে মিলে তাড়া করে বন্য জন্তুগুলোকে জঙ্গলের ভেতর থেকে খোলা জায়গায় নিয়ে এসে তাদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। কুকুরটা যখন জানোয়ারটাকে কাবু ক'রে ফেলে তখন তাকে বর্শার ঘায়ে অথবা গুলি ক'রে হত্যা করে। হান্‌ডাং-এর উখরুল বস্তির টাংখুলরা শিকারের সময় যে-কুকুরগুলোকে সঙ্গে করে নেয় সেগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। রং তাদের কুচকুচে কালো, পাগুলো ধবধবে শাদা। তাদের গায়ের লোম সূত্র-গুচ্ছের মত লম্বা লম্বা, ঘাড়ের কাছে ঝুটির মত। শিকার ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতে রাখবার রেওয়াজও মণিপুরের নাগাদের মধ্যে আছে।

ভাতই অবশ্য এদের প্রধান খাদ্য। তবে এদের এক রকম সর্ব্বভুক্ বললেই চলে। একমাত্র বিড়াল ছাড়া আর সমস্ত গৃহপালিত পশুর মাংসই এরা অবলীলা-ক্রমে উদরস্থ করে। বিড়ালের প্রতি এদের ভক্তি কিন্তু অপরিসীম। কোনো

কোনো গ্রামে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা দস্তুরমত ঘটা ক'রে বিড়ালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। টাংখুলদের মধ্যে এ ধারণা প্রচলিত যে, যদি কেউ বিড়াল বধ করে তাহ'লে চিরতরে তার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে যাবে। কুকুরের মাংসই এদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। ইম্‌ফলের সেনা কাইথেল বাজারে প্রচুর পরিমাণে কুকুর বিক্রী হয়। তা'ছাড়া গরু, মহিষ, হাতী, সাপ, ব্যাঙ, কীটপতঙ্গ কিছুই এদের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ পড়ে না।

খেলাধুলার প্রতি নাগাদের প্রবল আসক্তি আছে। ছক কেটে 'বাঘে-মানুষে' নামে এক ধরণের ক্রীড়া এদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত। টাংখুলদের মধ্যে দড়ি-টানাটানির খুব প্রচলন। এদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। টাংখুলদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের একত্রে নৃত্যগীত করবার রেওয়াজ আছে। লুহুপা গ্রামের পুরুষদের মধ্যে কেবলমাত্র এক ধরণের যুদ্ধ-নৃত্য প্রচলিত। নাচের সময় কয়েকটি মেয়ের কাজ হচ্ছে পুরুষদের অনবরত মদ জোগানো। নাচের সঙ্গে তালে তালে কাঁসর বাজতে থাকে। উখরুল গ্রামে কেবলমাত্র



নাগা-নৃত্য

বালিকাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাচের প্রচলন আছে, তা প্রায় মণিপুরী 'খুবাই-সাই-সাক্‌পা' নৃত্যের অনুরূপ। এদের মধ্যে কাবুইদের নৃত্য হচ্ছে সকলের

সেরা। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে চলতে থাকে ঢাকের বাদ্য আর কর্ণপটহ-ভেদী সঙ্গীত। এদের নৃত্যের পোষাকও জমকালো। পরনে কোমরে জড়ানো লাল বস্ত্রখণ্ড, মাথায় চক্‌চকে ধাতব শিরোভূষণ আর দীর্ঘ পাখীর পালক। নাচিয়েদের প্রত্যেকেরই দু'কানে দুটো ক'রে বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতির পাখা আটকানো থাকে। নাচের সময় এদের হাতে থাকে কারুকার্য্য-করা হাতলওয়ালা দা, সময় সময় বর্শা হস্তেও এরা নৃত্য করে। মেয়েদের মধ্যে কেবল কুমারীরাই নৃত্যে যোগদান করতে পারে। নৃত্য সুরু করবার আগে তরুণ-তরুণীরা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যায়। তার পর সকলে মিলে গান গাইতে গাইতে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। মেয়েদের হাতে থাকে এক একটি ক'রে বংশখণ্ড, ঢাকের বাজনার তালে তালে তারা সেগুলো দিয়ে মাটির ওপর ঘা মারতে থাকে। নাচ খুব ধীরে ধীরে সুরু হয়ে শেষে চলতে থাকে দ্রুততালে। নাচ শেষ হবার আগে দুটি মেয়ে বৃত্তের ভেতরে জোড় বেঁধে নৃত্য আরম্ভ করে। প্রায় পাঁচ-ছয় রকমের নাচ এদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কুমারী অবস্থায় নাগা মেয়েদের যৌন ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। টাংখুলদের মধ্যে শস্য-বপনাদি উপলক্ষ্যে যে-সমস্ত পরব অনুষ্ঠিত হয় তাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে দড়ি-টানাটানির প্রতিযোগিতা হয়। এ সময় তাদের সংযমের বাঁধন শিথিল হয়ে যায়। এদের সমাজের যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রচলিত আছে। অনেক সময় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হলে এরা নিজেরাই নিজেদের বিবাহ স্থির করে। অবশ্য বৃদ্ধা ঘটকীদের মধ্যস্থতায় বিয়ের কথাবার্ত্তা চালানোই সাধারণ প্রথা। এদের সমাজে বরকে কন্যাপণ দিতে হয়। আগেকার দিনে কাবুইদের সমাজে সাতটা মোষ, দুটো দা, দুটো বর্শা, কর্ণভূষণ ইত্যাদি কন্যাপণের বায়নাক্কা ছিল বিস্তর। আজকাল একশো ঝুড়ি চাল, একটা দা, কোদাল এবং কনের বাপমাকে পরনের কাপড় দিলেই বর কনেকে কিনে নিয়ে আসতে পারে। বিবাহ-উৎসবের সময় কন্যাপক্ষের লোকেরা বরপক্ষের কুমারদের সঙ্গে কুস্তি-প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়।

এই প্রতিযোগিতার ফলাফল থেকে বর-কন্যার মধ্যে কে দীর্ঘজীবী হবে তা স্থিরীকৃত হয়। বর্শানৃত্য ইয়াং নামক স্থানের বিবাহ-উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ।

আগেকার দিনে মানুষের মাথা কেটে আনা এদের সমাজে খুব একটা বাহাদুরি বলে গণ্য হ'ত। মানুষের মাথা কেটে আনলে সমাজের ধন সম্পদ শ্রী বৃদ্ধি হবে এ বিশ্বাসও মণিপুরের কোনো কোনো নাগা-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে অন্ততঃপক্ষে একটি নরমুণ্ডের মালিক না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহেচ্ছু যুবকের পক্ষে পাত্রী সংগ্রহ করাই ছিল অসম্ভব। গলায় ভল্লুকের দাঁতের হার, আর পরনের কড়ি-গাঁথা বস্ত্রখণ্ড ছিল নরমুণ্ডচ্ছেদকের নিদর্শন-চিহ্ন। পুরুষদের হৃদয়ে এই পৈশাচিক নরহত্যার প্রেরণা সঞ্চার করত মেয়েরা। গ্রাম্য উৎসবাদি উপলক্ষ্যে যখন স্ত্রী-পুরুষ একত্রে সমবেত হ'ত তখন পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন-চিহ্নসমূহবর্জ্জিত পুরুষকে মেয়েদের বিদ্রূপহাস্যে বিব্রত হতে হ'ত।

অন্যান্য আদিম জাতির মত মণিপুরের নাগারাও উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। অদ্ভুত গঠনের প্রস্তরখণ্ডগুলিকে এরা 'লাইফাম' বা উপদেবতার অধিষ্ঠানস্থল বলে নির্দ্দেশ করে। টাংখুলদের বিশ্বাস উরি এবং উরা নামে দু'জন দেবতা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের চারটা ক'রে হাত, চারটা ক'রে পা। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এদের ধারণা এই যে, আকাশ হচ্ছে পুরুষ আর পৃথিবী হচ্ছে প্রকৃতি। এদের দৃঢ়বদ্ধ নিবিড় আশ্লেষের ফল ভূমিকম্প, আর তাই থেকে পৃথিবীতে প্রাণলীলার বিকাশ।

মণিপুরের সকল শ্রেণীর নাগারাই মৃতদেহ গোর দেয়। টাংখুলরা খুব ঘটা ক'রে মৃতদেহ সমাহিত করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন কবর খনন করা হ'লে সম্পন্ন গৃহস্থেরা একটি মহিষ বলি দেয়। মহিষটার নাড়ীভুঁড়ির অর্দ্ধেকটা নেয় মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজনরা, বাকী অর্দ্ধেকটা নেয় কবর খননকারীরা। প্রাণীটার হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক (Kidney) ইত্যাদি জোটে 'শেরা' বা গ্রাম্য পুরোহিতের ভাগ্যে। এ সমস্ত রান্না ক'রে সে কতকগুলো মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক

'কামিও' বা উপদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে। পুরোহিত কর্ত্তৃক কতকগুলো ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হবার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সমবেত লোকদের এই রান্না-করা মাংস এবং ভাত পরিবেশন করা হয়, এবং সকলে মিলে মহা আনন্দে গোরস্থানে ভোজে প্রবৃত্ত হয়। ভোজন-পর্ব্ব শেষ হ'লে সুরু হয় মৃতদেহ সমাহিত করবার আয়োজন। মৃতের একটি আত্মীয় জ্বলন্ত মশাল হস্তে কবরের ভিতর ঢুকে, মশালটি ঘুরাতে ঘুরাতে স্বর্গত পিতৃপুরুষদের নিকট এই প্রার্থনা জানায়, তারা যেন মৃত ব্যক্তির 'কাজাইরাম' (পরলোক) যাত্রার পথে তার সঙ্গে এসে দেখা করেন। তার পর মৃতের হাত দু'খানি জল দিয়ে খুব ভাল ক'রে ধুইয়ে দেওয়া হয়। তখন তার আত্মীয়স্বজনরা সকলে এক জায়গায় জড় হয়ে মড়াকান্না জুড়ে দেয় এবং কবরটিকে দু'তিন বার প্রদক্ষিণ করে। তারপর মৃতদেহটিকে শবাধারের সঙ্গে খুব শক্ত করে বেঁধে কবরে রাখা হয় এবং যাতে মৃতদেহে মাটি না লাগতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কবরের ভেতর পাথর দিয়ে তারা একটি বেষ্টনী নির্ম্মাণ করে। কবরে মাটি চাপা দেওয়া হ'লে পর 'শেরা' বা পুরোহিতকে মৃত্তিকাস্তূপের ওপর একটি টাঙ্গি রাখতে হয়। সর্ব্বশেষে সমাধিক্ষেত্রে একটি দেবদারু কাঠের মশাল জ্বালিয়ে রেখে সকলে মৃতব্যক্তির গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এদের বিশ্বাস যে সমাহিত হবার পর দিন কবরের অন্ধকার গহ্বর থেকে মৃতের পুনরুত্থান হয়, সেদিনই অশরীরী আত্মা তার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে ফিরে আসে। তাই ক্রমাগত কয়েক দিন পর্য্যন্ত রাতদিন সকল সময়েই লোকান্তরিত প্রিয়জনের জন্যে তাদের গৃহদ্বার অবারিত থাকে।

স্বাধীন মণিপুরের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়

স্বাধীন মণিপুরের অতীত ইতিহাস যেমনই গৌরবময়, মণিপুরের স্বাধীনতা-বিলোপের কাহিনীও তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। স্বাধীন মণিপুরের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে মহাবীর টিকেন্দ্রজিৎ আর থঙ্গাল জেনারেলের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। টিকেন্দ্রের বীরত্ব-গাথা আজো মণিপুরের ঘরে ঘরে পরিকীর্ত্তিত। তিনি ছিলেন মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তির তৃতীয় পুত্র; মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্রোহী নাগাদের দমন করে ইংরাজদের মান-ইজ্জৎ রক্ষা করেছিলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল প্রবল পরাক্রমে মণিপুরে রাজত্ব করেছিলেন। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত কুলচন্দ্রকে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করে যান। চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যুর পর মহারাজ শূরচন্দ্র একটি দরবারের আয়োজন ক'রে রাজ্যের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় এবং পাত্র-মিত্র সবাইকে আমন্ত্রণ করেন। দিনকতক পরে সেনাপতি ঝালকীর্ত্তির মৃত্যু হ'লে পর শূরচন্দ্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে টিকেন্দ্রজিৎকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। টিকেন্দ্র ছিলেন মণিপুরের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয় পাত্র। কি যাদু ছিল তার বিশালায়ত দুটি চোখে! যে দেখত সেই তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারত না। টিকেন্দ্র সেনাপতির পদে নিযুক্ত হওয়াতে মণিপুরের সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অতুলনীয় বীরত্ব প্রকাশ ক'রে টিকেন্দ্র একে একে বিদ্রোহীদের দমন করতে লাগলেন। সমস্ত মণিপুর রাজ্য তাঁর প্রশংসায় শতমুখ। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভৈরবজিৎ বা পাক্কাসেনার তা সহ্য হ'ল না। তিনি স্থরু করলেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এতে মণিপুর রাজ্যে হিংসা দ্বেষ এবং গৃহ-বিবাদের সূত্রপাত হ'ল।

এই সময় মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন মিঃ গ্রিম্‌উড। মিঃ এবং

মিসেস গ্রিম্‌উডের সঙ্গে টিকেন্দ্রজিতের খুব হৃদ্যতা জন্মেছিল। মিসেস্ গ্রিম্‌উড মণিপুর সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি-কথায় টিকেন্দ্রের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন—"সেনাপতি ছিলেন একজন ওস্তাদ খেলোয়াড়, বন্দুক ছোড়ায় সুদক্ষ এবং অত্যন্ত বলবান্ পুরুষ। মণিপুরীরা আমাদের বলত যে, সমগ্র মণিপুর রাজ্যে তার তুল্য বলশালী ব্যক্তি আর দ্বিতীয়টি ছিল না। মারাত্মক রকমের ভারী বস্তু অবলীলাক্রমে উত্তোলন ক'রে, অনায়াসে তিনি তা বহু দূরে নিক্ষেপ করতে পারতেন। পোলো খেলার সময় 'ষ্টিকে'র এক আঘাতে যখন তিনি বলটাকে অর্দ্ধেক মাঠ অতিক্রম ক'রে ফেলে দিতেন, তখনকার দৃশ্যটি ভারি উপভোগ্য হ'ত। অশ্বারোহণেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা, প্রায়ই তিনি সুন্দর সুন্দর টাট্টু ঘোড়ায় আরোহণ করতেন। মাথায় ছিল তাঁর দীর্ঘ কেশ। সেগুলোকে তিনি ঘাড়ের ওপর গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে বেণীর মত ঝুলিয়ে রাখতেন।"

এদিকে টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে পাক্কাসেনার বিরোধ ক্রমশঃ বেড়েই চলতে লাগল। এঁদের এই বিরোধের জন্যে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারও নাকি খানিকটা দায়ী। মাইপাকবী নামে মণিপুরের সেরা সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে উভয়েরই ছিল প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ধনী স্বর্ণকারের সুন্দরী কন্যা, মাইপাকবী রাজপ্রাসাদের নিকটেই বাস করত। সে ছিল ষোড়শী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, সাধারণ মণিপুরী মেয়েদের চেয়ে দীর্ঘাঙ্গী। মাথায় ছিল তার প্রচুর কালো কেশভার, সব সময়ই সে খুব সাজগোজ করে থাক্‌ত। এই মাইপাকবীকে নিয়ে শেষে একদিন যুবরাজের সঙ্গে পাক্কাসেনার তুমুল কলহ হয়। মহারাজা নাকি পাক্কাসেনার পক্ষাবলম্বন করেন। এমনিভাবে বিরোধ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। অবশেষে আট জন রাজভ্রাতা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদিকে মহারাজা, পাক্কা সেনা, সামু হেঞ্জেবা, এবং দলরাই হেঞ্জেবা এবং অন্যদিকে যুবরাজ, সেনাপতি, আঙ্গেয় সেনা, এবং তরুণ রাজকুমার জিল্লা সিং।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে উভয় পক্ষের বিরোধ একেবারে

চরমে উঠল। তরুণ রাজকুমার জিল্লা সিংহের সঙ্গে পাক্কসেনার ক্রমাগত ঝগড়া চলছিল। শেষে জিল্লা সিং দরবারে একদিন অপমানিত হলেন। অবশ্য এর মূলে ছিল পাক্কাসেনারই কুপমামর্শ। কালবিলম্ব না করে জিল্লা সিং সেনাপতির সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করলেন। এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে একদিন (১৮৯০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর) মধ্যরাত্রে সমস্ত রাজপুরী যখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন তখন জিল্লা সিং, আর তার ভাই আঙ্গেয় সেনা একদল অনুচর সহ রাজপুরীর পাচিল টপ্‌কে রাজপ্রাসাদে ঢুকে মহারাজের শয়ন-কক্ষ লক্ষ্য করে ক্রমাগত বন্দুকের গুলি বর্ষণ করতে লাগলেন। মহারাজা শূরচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির লোক। তিনি খিড়কির দ্বার দিয়ে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন।

এই সময় টিকেন্দ্রজিৎ এসে জিল্লা সিং প্রভৃতির সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি কেল্লা, বারুদখানা প্রভৃতি সমস্তই দখল করলেন।

এদিকে রাত দুটোর সময় মহারাজ পালিয়ে ব্রিটিশ রেসিডেন্সীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেনাপতির ভয়ে তিনি এত ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, মিঃ গ্রিম্‌উডের নিকট তিনি রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে চলে যাবার সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন। প্রায় ছয়ত্রিশ ঘণ্টা রেসিডেন্সীতে অবস্থান করবার পর মহারাজা, মিঃ গ্রিম্‌উডের ব্যবস্থামত গুর্খা সৈন্য পরিবৃত হয়ে রাজধানী পরিত্যাগ ক'রে কাছাড়ের পথে রওনা হলেন। (১২৯৮ সনের ৮ই আশ্বিন)

শূরচন্দ্র রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে চলে যাওয়ার পর তাঁর ভ্রাতা কুলচন্দ্র রাজ-প্রতিনিধির (Regent) পদে অভিষিক্ত হলেন আর সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ লাভ করলেন যুবরাজের পদ। এখন রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। তাঁর সুশাসনে রাজ্যে সকল বিষয়েই প্রভূত উন্নতি সাধিত হ'ল। প্রজারাও সুখে স্বচ্ছন্দে, সন্তুষ্টচিত্তে কাল যাপন করতে লাগল। সুযোগ এবং অবসর পেয়ে যুবরাজ এবার মাইপাকবীকে বিয়ে ক'রে তাকে তাঁর নবম পত্নীর স্থলাভিষিক্ত করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন।

এদিকে নির্ব্বাসিত মহারাজা শূরচন্দ্র তখন কলকাতায় থেকে হৃতরাজ্য ফিরে পাবার আবেদন জানিয়ে আসামের চিফ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট একাধিক পত্র লিখলেন। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন টিকেন্দ্রজিৎকেই মণিপুরের সকল বিভ্রাটের মূল মনে করে, রাজ্য থেকে কৌশলে নির্ব্বাসিত করবার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্যে কুইণ্টন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ কর্ণেল স্কীনের অধীনে কয়েক শত সৈন্যসামন্ত নিয়ে গোলাঘাট থেকে মণিপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। ২২শে মার্চ্চ তারিখে সকাল-বেলায় কুইণ্টন সদলবলে মণিপুরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সীতে এসে অশুভ-পদার্পণ করলেন, সেখানে রাজসমারোহে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন হ'ল।

কুইণ্টন মণিপুরে পৌঁছেই এক দরবারের আয়োজন করলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য টিকেন্দ্রজিৎকে দরবারে আমন্ত্রণ ক'রে এনে, কৌশলে বন্দী ক'রে কয়েক বৎসরের জন্যে মাতৃভূমি থেকে নির্ব্বাসিত করা। মিঃ গ্রিম্‌উডের ওপর আদেশ হ'ল দরবার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তিনি যুবরাজকে বন্দী করেন। এতে মিঃ গ্রিম্‌উড অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, কেননা, টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে ছিল তাঁর তিন বৎসরের অকৃত্রিম সৌহৃদ্য।

দরবারের আয়োজন ক'রে কুইণ্টন রাজা এবং রাজভ্রাতাদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ পূর্ব্বাহ্নেই এ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন, তাই নিজে না গিয়ে দূত-মুখে সংবাদ পাঠালেন যে, অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি দরবারে হাজির হতে অসমর্থ। সুতরাং ২৩শে মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত দরবারের অধিবেশন স্থগিত রইল। ইতিমধ্যে যুবরাজ কুইণ্টনের কুমতলব সম্বন্ধে পুরাপুরি ওয়াকিফ্‌হাল হয়ে উঠলেন। ২৩শে তারিখ সকালে দরবারের পুনরধিবেশন হওয়ার কথা। বেলা আটটার সময় খবর এল যে, যুবরাজ অত্যন্ত অসুস্থ এবং সেজন্যে কুলচন্দ্রের পক্ষেও আসা সম্ভব নয়। বেলা চারটার সময় মিঃ গ্রিম্‌উড যুবরাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রাজপ্রাসাদে গিয়ে পৌঁছলেন। অনেক চেষ্টা করেও

তিনি যুবরাজকে সম্মত করাতে পারলেন না। অসুস্থ যুবরাজ একটা ডুলিতে ক'রে গ্রিম্‌উডের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

টিকেন্দ্রজিংকে বন্দী করবার সকল কৌশল যখন ব্যর্থ হ'ল তখন কুইণ্টন রেসিডেন্সীর অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করলেন যে, শেষরাত্রে অতর্কিতভাবে রাজপুরী আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করতে হবে। একদিন শেষ-রাত্রে লেফটেন্যাণ্ট ব্রাকেনবারী এবং কাপ্তেন বুচার প্রভৃতি কয়েকজন সেনানায়ক অনেক সৈন্য সামন্ত সহ রাজপ্রাসাদের ওপর চড়াও হলেন। কাপ্তেন বুচার পাঁচিল টপ্‌কে যুবরাজের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সমস্তই হ'ল বৃথা পণ্ডশ্রম। সকলের চোখে ধুলা দিয়ে নিজ পরিজনবর্গসহ টিকেন্দ্রজিং কি ভাবে যে অন্তর্ধান করলেন কাপ্তেন বুচার সে-রহস্য কিছুতেই ভেদ করতে পারলেন না।

অকস্মাৎ মণিপুর দুর্গে ঘোর রবে রণ-দামামা বেজে উঠল, মণিপুরী সৈন্যদের আকাশ-ফাটা চীৎকারে কানে তালা লাগবার জোগাড় হ'ল। ইংরাজদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অতর্কিত আক্রমণের প্রতিশোধ নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে এবার তারা অবিশ্রান্তভাবে ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর ওপর গোলাবর্ষণ সুরু করলে। গোলাগুলির আঘাতে রেসিডেন্সীর দরজা জানালার কাচের সার্সিগুলো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল, বিভিন্ন কক্ষে চলল ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। অপরাহ্নকালে লেফটেন্যাণ্ট ব্রেকেনবারীকে পাওয়া গেল গুরুতররূপে আহত অবস্থায় রাজপ্রাসাদের উত্তর দিকস্থ নদীতীরে। তাঁকে ধরাধরি ক'রে হাসপাতালে নিয়ে আসা হ'ল।

এদিকে সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সাতটা বেজে গেল, তবুও গোলাবর্ষণের বিরাম নেই। রেসিডেন্সীতে ছিলেন একজন মাত্র ইংরেজ মহিলা। তিনি পলিটিক্যাল এজেণ্টের পত্নী মিসেস্ গ্রিম্‌উড। বেগতিক দেখে অবশেষে মিঃ কুইণ্টন, কর্ণেল স্কীনে, মিঃ কসিনস্, মিঃ গর্ডন, মিঃ এবং মিসেস্ গ্রিম্‌উড এঁরা সকলেই মাটির নীচেকার ভাঁড়ার-ঘরে আশ্রয় নিলেন। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে ইংরাজেরা

মণিপুরীদের সঙ্গে সন্ধি করাই স্থির করলেন। রেসিডেন্সীতে যুদ্ধবিরতির 'বিউগল' বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই মহানুভব টিকেন্দ্রজিতের হুকুমে মণিপুরীরা গোলা বর্ষণে বিরত হ'ল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় চিফ কমিশনার কুইণ্টন, কর্ণেল স্কীনে, কসিন্স, লেফটেনাণ্ট সিম্পসন এবং মিঃ গ্রিম্‌উড এই পাঁচজন ইংরাজ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাজপ্রাসাদে টিকেন্দ্রজিতের নিকট গিয়ে হাজির হলেন। যুবরাজ তাঁদের বললেন যে, ইংরেজরা যদি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করতে রাজী হন তাহ'লেই শুধু সন্ধি হতে পারে। গ্রিম্‌উড প্রভৃতি এ আত্মসম্মান-হানিকর প্রস্তাবে রাজি হতে না পেরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করবার উপক্রম করলেন। যুবরাজও চিন্তাকুল মনে অন্যদিকে রওনা হলেন।

যুবরাজ দৃষ্টির বহির্ভূত হবামাত্রই অকস্মাৎ রুদ্ধ হ'ল রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার, প্রতিশোধ-কামনায় ক্ষিপ্তপ্রায় মণিপুরীরা সাহেবদের ওপর এলোপাথাড়ি প্রহার চালাতে লাগল। এক মণিপুরীর তীক্ষ্ণধার বর্শার আঘাতে মিঃ গ্রিম্‌উড় নিমেষ-মধ্যেই পঞ্চত্ব লাভ করলেন। যুবরাজ এ সময় ছিলেন স্থানান্তরে। মণিপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা যাঁর নামে আতঙ্কে শিউরে উঠত, সেই দুর্দ্ধর্ষ থঙ্গাল জেনারেল* তখন ছিলেন তোপখানায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। হঠাৎ এক বৃদ্ধ ঝড়ের বেগে তাঁর কক্ষে এসে প্রবেশ করলে। একটি পুত্র তার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছে, আর একটিও মৃত্যুপথযাত্রী। উত্তেজিতকণ্ঠে সে থঙ্গালকে স্মরণ করিয়ে দিলে তাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। তাতে নাকি লেখা আছে যে, এ যুদ্ধের সময়

মিসেস্ গ্রিম্‌উডের পুস্তকে থঙ্গাল জেনারেল সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। তিনি লিখেছেন :— "থঙ্গাল ছিলেন অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, সাধারণ মণিপুরীদের চেয়ে দীর্ঘকায় এবং বয়সের তুলনায় আশ্চর্য্য রকম কর্ম্মক্ষম। বার্দ্ধক্যের বলি-রেখা-অঙ্কিত হলেও তাঁর মুখশ্রী ছিল সুন্দর। তরুণ বয়সেই রাজ্যের বিপুল কর্ম্মভার তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছিল। তাঁর মাথায় ছিল শুভ্র কেশ, চোখের ভ্রূগুলো পর্য্যন্ত সব শাদা, লম্বা লম্বা আর নীচের দিকে ঝুলানো। তাঁর দীর্ঘ বক্র নাসায় ছিল চতুরতার পরিচয় আর সুগঠিত আননে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। থঙ্গালকে দেখলেই আমার ঈগল পাখীর কথা মনে পড়ত। ঈগলের মতই তাঁর গভীর কালো চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, তীব্র ও অন্তর্ভেদী। মণিপুর রাজ্যে যে কি পরিমাণ নরহত্যা তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার পরিমাপ করা সাধ্যের অতীত।"

পঞ্চশত্রুর শোণিত পাত ক'রে তাদের মুণ্ড একত্রে একটি খদে প্রোথিত না করলে তাদের মাতৃভূমির কিছুতেই আর কল্যাণ নেই। বৃদ্ধের কথা শুনে উত্তেজনায় থঙ্গালের সর্ব্বশরীর থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। তার হুকুমে সাগন্নেসবা ধনসিং নামক ঘাতকের খড়্গে বাকী চারজন ইংরাজের জীবন-লীলা সাঙ্গ হ'ল। পাঁচটি মুণ্ড একটি খদে একত্রে প্রোথিত ক'রে মণিপুরীরা তাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশ প্রতিপালন করলে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও কিন্তু মণিপুরীদের প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রশমিত হ'ল না। আবার তারা চারিদিক বেষ্টন করে রেসিডেন্সীর ওপর কামান দাগতে লাগল।

রাত তখন প্রায় দুটো; বাইরে প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণ চলছে। এরই মধ্যে মিসেস্ গ্রিম্‌উড এবং রেসিডেন্সীর অন্যান্য ইংরেজগণ পথে এসে দাঁড়ালেন। মিসেস্ গ্রিম্‌উডের ঠিক পায়ের কাছেই একটি বোমা ফাটল। রেসিডেন্সী থেকে বেরিয়ে একটি নদী পার হয়ে তাঁরা কাছাড়ের রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন। একে জ্যোৎস্নারাত্রি বলে সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় তার ওপর আহতরাও চলেছে তাঁদের সঙ্গে। সুতরাং সন্তর্পণে, অতি ধীরে ধীরে তাঁরা অগ্রসর হতে লাগলেন। মিসেস্ গ্রিম্‌উড এ রাস্তা দিয়ে বহুবার কাছাড় পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা করেছিলেন। তাই এ-পথের অন্ধি-সন্ধি সমস্তই ছিল তাঁর নখদর্পণে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন এ পলাতকদের পথ-প্রদর্শিকা। আন্দাজ মাইল চারেক এগোবার পর পেছন ফিরে তাকিয়ে মিসেস গ্রিম্‌উড দেখেন, সমস্তটা আকাশ আগুনের আভায় আলোকিত হয়ে উঠেছে আর সেই লেলিহান্ অগ্নিশিখায় তাঁদের নবীন দাম্পত্য-জীবনের চারিটি বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত রেসিডেন্সীর প্রাসাদোপম ভবন ভস্মীভূতপ্রায়।

চলতে চলতে রাত্রি প্রভাত হ'ল। পেটে অন্ন নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই,—মাথার ওপর সূর্য্যের প্রচণ্ড দীপ্তি। মিসেস্ গ্রিম্‌উড রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে একজন সামরিক কর্ম্মচারীর শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ আকাশ-ফাটা চীৎকার-শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন বর্শা এবং দা

হাতে একদল নাগা নৃত্য করতে করতে তাদের অনুসরণ করছে। বন্দুকের আওয়াজ শুনে অবশ্য তারা ভয়ে পালিয়ে গেল।

এমনিভাবে নানা বিপদ আপদ অতিক্রম ক'রে, ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রমে মৃতপ্রায় অবস্থায় ৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁরা জিরি নদী অতিক্রম করে লখীপুরে এসে পৌছলেন। লখীপুরে একটি দিন কাটিয়ে অবশেষে তাঁরা শিলচরে উপস্থিত হলেন। কাছাড়, কোহিমা, টামু প্রভৃতি স্থানে যে-সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁদের কাছে অনতিবিলম্বে মণিপুরের দুঃসংবাদ গিয়ে পৌছল। টামু সমর-শিবিরের লেফটেন্যান্ট গ্রাণ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য সহ মণিপুরের দিকে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে কুইণ্টন প্রভৃতির শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হ'ল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। পালেল নামক স্থানে মণিপুরীদের আক্রমণ প্রতিহত করে গ্রাণ্ট অগ্রসর হতে লাগলেন এবং ইম্ফলের ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে থোবালে পৌছে সেখানকার একটি দুর্গ দখল করলেন। এদিকে মণিপুরের স্বাধীনতা-লোপের জন্যে সুরু হ'ল বিপুল আয়োজন। কাছাড়, কোহিমা, টামু এই তিন দিক দিয়েই পঙ্গপালের মত বিপুল ব্রিটিশবাহিনী মণিপুরে প্রবেশ করতে লাগল। মেজর কলেট মণিপুর-যুদ্ধের অধিনায়কের পদে বৃত হয়ে ২০শে এপ্রিল তারিখে সসৈন্যে কোহিমা থেকে মণিপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। ২৩শে এপ্রিল বিষেণপুর থেকে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী নারায়ণগণ গ্রামে উভয় দলের একটি যুদ্ধ বাধে, মণিপুরীরা তাতে পরাস্ত হয়। এর পর ২৫শে তারিখে পালেলে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, তাতে মণিপুরীরা অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের দুর্দ্দিন তখন ঘনিয়ে এসেছে। পালেলের যুদ্ধে তাদের পর্য্যুদস্ত ক'রে জেনারেল কলেট বীরদর্পে মণিপুরে পৌছে রাজধানী দখল করলেন। কিন্তু রাজধানীতে তখন জনপ্রাণী নেই, চারিদিকে ভয়াবহ মহাশ্মশানের নিস্তব্ধতা। যে যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে গেছে। মহারাজা, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সকলেই পলাতক। সেই পরিত্যক্ত শূন্য পুরীতে ব্রিটিশের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন

হ'ল। কলেট ঘোষণা করলেন, মণিপুর রাজ্যে কেউ আর বন্দুক, তরবারী প্রভৃতি নিজের অধিকারে রাখতে পারবে না। আর যারা মহারাজা, টিকেন্দ্রজিৎ, থঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতি রাজশত্রুকে ধরিয়ে দিতে পারবে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। থঙ্গাল জেনারেল, মহারাজা প্রভৃতি একে একে ধৃত হয়ে ইংরাজের হস্তে সমর্পিত হলেন। শুধু, টিকেন্দ্রজিৎ কোথায় আছেন তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।

টিকেন্দ্রজিৎ ছিলেন রাজধানীর অনতিদূরেই আতঙ্গজান নামক পল্লীতে বলরাম সিংহের বাড়ীতে আত্মগোপন করে। তাঁর শরীর তখন অসুস্থ। কুইণ্টনের আসামে আগমনের পর থেকেই তাঁর একটা-না-একটা অসুখ লেগেই ছিল। তার উপর চিরকাল সিংহবিক্রমে যিনি অপ্রতিহত প্রতাপে মণিপুর রাজ্যে বিচরণ করেছেন, এই ঘৃণ্য পলাতক-জীবন বোধ করি তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল, সমস্ত অন্তর তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল চিরমুক্তির জন্যে। একদিন তিনি তাঁর আশ্রয়দাতাকে বললেন যে, তিনি ধরা দিতে চান। বলরাম তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। কিন্তু, টিকেন্দ্র কিছুতেই কর্ণপাত করলেন না। বলরামকে অগত্যা ইংরেজের সুবাদারের নিকট খবর দিতে হ'ল। সুবাদার এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। তার পর তাঁর নিজ প্রাসাদের মন্দিরের মধ্যেই তাঁকে বন্দী করে রাখা হ'ল।

টিকেন্দ্রজিতের বিচারের রায় প্রকাশিত হ'ল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে। বিচারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়াই সাব্যস্ত হ'ল।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট,—অপরাহ্ন-কাল।

বিস্তীর্ণ পোলো খেলার ময়দানে সামনা-সামনি দুইটি ফাঁসি-কাষ্ঠ স্থাপিত। চারিদিক ঘিরে পাঁচ শত সশস্ত্র গুর্খাসৈন্য দাঁড়িয়ে। সহস্র সহস্র মণিপুরী, নাগা, কুকি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নরনারী তাদের প্রিয় কৈরণকে—টিকেন্দ্র এ নামেই মণিপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত ছিলেন—একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে ময়দানে এসে জমায়েৎ হয়েছে, এত বড় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তিলধারণের জায়গাটি পর্য্যন্ত নেই। ফাঁসির সময় কাছিয়ে এল। টিকেন্দ্রজিৎ নির্ভীক,

প্রশান্ত আননে তাঁর আশঙ্কা-উদ্বেগের চিহ্নমাত্রও নেই। ফাঁসিমঞ্চের ওপর ওঠে স্মিতহাস্যে ধীরে ধীরে বন্ধনরজ্জুর দিকে গলাটি বাড়িয়ে দিলেন। তারপর কয়েকজনে ধরাধরি করে অশীতিপর বৃদ্ধ, অথর্ব্ব, উত্থানশক্তি-রহিত থঙ্গাল জেনারেলকে একটা টুলের ওপর বসিয়ে দিলে। নিমেষ-মধ্যে উভয়েরই নীচেকার আসন দুটি সরিয়ে নেওয়া হ'ল। বিস্তীর্ণ ময়দানের ওপর গলবদ্ধরজ্জু দেহদুটি ঝুলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই জনতার মধ্যে হাহাকার উত্থিত হ'ল, টিকেন্দ্রজিতের আট জন পত্নী আর তার নয় বৎসরবয়স্ক একমাত্র পুত্র চৌবার আর্ত্তক্রন্দনে বধ্যভূমি পূর্ণ হয়ে উঠল।

টিকেন্দ্রের ফাঁসির পর মহারাজ কুলচন্দ্র মণিপুর থেকে চিরতরে নির্ব্বাসিত হ'লেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরকে দেশীয় রাজ্যে পরিণত করে চূড়াচাঁদ নামক একটি পাঁচ বছরের বালককে রাজা ক'রে দিলেন। মণিপুরের স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হল, সুরু হ'ল ইংরাজের অধীনে মণিপুরের ইতিহাসের নূতন অধ্যায়।

কিছুকাল হ'ল চূড়াচাঁদ পরলোকগমন করেছেন। সম্প্রতি তাঁর পুত্র ছয়ত্রিশ বৎসরবয়স্ক বোধচন্দ্র সিং মণিপুরের মহারাজা। চূড়াচাঁদের আমলেই বাংলা-দেশের সঙ্গে মণিপুরের সংস্কৃতিগত যোগটি গভীর হয়ে ওঠে। মহারাজা স্বয়ং প্রায়ই বাস করতেন নবদ্বীপ তীর্থে। এতে বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর একটি গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাজকুমার প্রিয়ব্রত সিংহ বি-এর উদ্যোগেই মণিপুরে বিশেষভাবে সাহিত্য ও শিল্পকলার অনুশীলন আরম্ভ হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে তাঁরই উদ্যোগে মণিপুর সাহিত্য-পরিষৎ ও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠাও চূড়াচাঁদের আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে মণিপুর

চূড়াচাঁদের* পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র মহারাজা বোধচন্দ্র সিং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্বাধীনতা বিলোপের পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীরও উর্দ্ধকাল যাবৎ এই দেশীয় রাজ্যটির অধিবাসীরা নিরুদ্বেগে নির্ভাবনায় দিন যাপন করে আসছিল, কিন্তু অকস্মাৎ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে জাপানী বিমানের বোমা-বর্ষণে মণিপুর উপত্যকাবাসীর শান্তিপূর্ণ জীবনধারা ব্যাহত হ'ল। প্রায় চার মাসের† কাছাকাছি হতে চলল এখনো জাপানীরা মণিপুর রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয় নি। নিভৃত পার্ব্বত্য-অঞ্চল আর উপত্যকা-ভূমি আজো রণ-কোলাহলে মুখরিত।

মণিপুরের যুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছুদিন পরে একখানা ইংরাজী খবরের কাগজে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রকাশিত হয়—"Whoever holds Imphal holds the weapon which can be turned towards India or Burma" অর্থাৎ "যে-পক্ষই ইম্ফল দখল করতে পারবে ভারতবর্ষ বা ব্রহ্মদেশে অভিযান চালনা করার সুবিধা তারই তত বেশী।" এই উক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর গুরুত্ব বুঝতে হ'লে, মণিপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাস্তাঘাট সম্বন্ধে মোটামুটি একটু জেনে রাখা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন আসাম প্রদেশটির শুধু পশ্চিম দিকেই বাংলাদেশের সমতল ভূমি, তা ছাড়া আর তিন দিকেই উক্ত প্রদেশটি পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। অতীতে এই সমস্ত পর্ব্বতমালা অতিক্রম ক'রে মোঙ্গোলীয় মহাজাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা আসামের বিভিন্ন পার্ব্বত্য অঞ্চলে এসে বসতি

* চূড়াচাঁদ ১৯০৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী রাজপদে অভিষিক্ত হন।

† প্রবন্ধটি জুলাইএর প্রথম সপ্তাহে লিখিত।

স্থাপন করেছিল। বস্তুত এদেশে যত বিচিত্র আদিম জাতির বাস ভারতবর্ষের আর কোথাও তত নেই। সেইজন্যই বহু দিন আগে ফুলার সাহেব Playfair-এর The Garos নামক পুস্তকের ভূমিকায় নানা জাতির অধ্যুষিত আসাম প্রদেশটিকে নানা জাতির মিউজিয়াম (A museum of Nationalities) বলে উল্লেখ করেছিলেন।

আসামের দক্ষিণ প্রান্তস্থ লুসাই পাহাড়ের পশ্চিম দিকে স্বাধীন ত্রিপুরার পাহাড় এবং পূর্ব্ব দিকে চিন পাহাড়। চিন পাহাড়ের ঠিক উত্তর দিকেই আসামের তথা ভারতবর্ষের পূর্ব্বে ভারত-ব্রহ্ম সীমায় মণিপুর রাজ্য অবস্থিত। আসামের কুকি এবং মণিপুরীদের সঙ্গে চিন পাহাড়ের অধিবাসী পার্ব্বত্য জাতির ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। এজন্যে ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং নৃতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে মণিপুরীরা কুকি-চিনদের জ্ঞাতি। সুদূর অতীতে চিন পাহাড় থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে এসেই তারা মণিপুরে বসতি স্থাপন করেছিল।

মণিপুর রাজ্যের আয়তন ৮৪৫৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে শস্যশ্যামল ইম্ফল উপত্যকার আয়তন ৭০০ বর্গমাইল,—লোকসংখ্যা ৭,৫০,০০০। হিন্দুর সংখ্যাই বেশী, তা ছাড়া মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী মণিপুরীও অনেক আছে। নাগা, কুকি প্রভৃতি আদিম জাতির সংখ্যাও কম নয়। মণিপুরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক বেশী।

মণিপুর রাজ্যটি প্রায় চারদিকেই পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। উত্তর দিকে নাগা পাহাড়, পশ্চিমে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে লুসাই পাহাড় ও চিন পাহাড় আর পূর্ব্বে উত্তর ব্রহ্মের শাণ রাজ্য। চিন্দুইন নদী উত্তর ব্রহ্মের পার্ব্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হ'য়ে, মণিপুরের পূর্ব্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণাভিমুখে চলে গেছে। মণিপুর রাজ্যের নদীসমূহ বেশীর ভাগই উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব বা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পর্ব্বতরাজি থেকে উৎপন্ন হয়ে চিন্দুইন নদীতে গিয়ে পড়েছে। শুধু রাজধানীর পূর্ব্ব দিক বেষ্টন করে মণিপুর নামে যে নদীটি প্রবাহিত সেটি দক্ষিণে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। চিন্দুইন নদীর পশ্চিম তীর থেকে মণিপুর রাজ্যের দূরত্ব খুব বেশী নয়।

সমগ্র মণিপুর রাজ্যই ছোট-বড় পাহাড়শ্রেণীতে পরিপূর্ণ। কোনো কোনো স্থানে পর্ব্বত-শৃঙ্গের উচ্চতা সাড়ে ছয় হাজার ফুট পর্য্যন্ত। এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে উপত্যকা ও অধিত্যকার সংখ্যা শত-শত। কিন্তু মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল যে উপত্যকায় অবস্থিত তা-ই সর্ব্বপ্রধান। মণিপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্ম-সীমায় অবস্থিত কাবো আর একটি প্রধান উপত্যকা। এই উপত্যকাটিও এবারকার যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে জাপ-বাহিনী উত্তর ব্রহ্মের মোগাউং নদীর তীর, চিন পাহাড়ের রথিদাউং এবং টিড্ডিম, মণিপুরের তামু, পালেল, ইম্ফল, উখরুল, ও নাগাপাহাড়ের কোহিমা প্রভৃতি স্থানে বাহু বিস্তার ক'রে অগ্রসর হয়েছিল। চিন পাহাড় থেকে উত্তরাভিমুখী একটি রাস্তা মণিপুর নদীর পূর্ব্ব তীর ধরে বিষেণপুর হয়ে ইম্ফল পর্য্যন্ত চলে গেছে। টিড্ডিম চিন পাহাড়ে এই রাস্তার পাশেই অবস্থিত। কাবো উপত্যকার সন্নিকটে, মণিপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে মণিপুর এবং ব্রহ্মদেশের সীমা-রেখায় তামু অবস্থিত। ইম্ফল থেকে একটি রাস্তা পালেল তামু হয়ে মণিপুরের সীমা অতিক্রম করে চিন্দুইন নদীর তীরাভিমুখে চলে গিয়েছে। আবার ইম্ফল থেকে আর একটি রাস্তা উত্তর-পূর্ব্বদিকে সোম্রা পার্ব্বত্য অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী উখরুল পয্যন্ত চলে গিয়েছে। ইম্ফল থেকে উখরুলের দূরত্ব ৩৭ মাইল। এই রাস্তাটিই উখরুল থেকে বাঁ দিকে বেঁকে উত্তরে কোহিমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ডিমাপুর-ইম্ফল মোটর-রাস্তার কথা মণিপুর ভ্রমণ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এইটিই হচ্ছে মণিপুরের সর্ব্বপ্রধান রাস্তা। সাধারণত এটি মণিপুর রোড্ নামেই পরিচিত। কোনো কোনো জায়গায় এ রাস্তার উচ্চতা ৮ হাজার ফুট। ইম্ফলের সমতল থেকে উত্তর দিকে ক্রমোচ্চ ভাবে উঠে রাস্তাটি ৯০ মাইল দূরবর্ত্তী, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত নাগাপাহাড়ের রাজধানী কোহিমায় এসে পৌছেছে ; এবং সেখান থেকে পশ্চিম দিকে বেঁকে ক্রমনিম্নভাবে ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী ডিমাপুর নামক স্থানে গিয়ে পৌছেছে। ডিমাপুরের রেলষ্টেশনের

নামই মণিপুর রোড্ ষ্টেশন। নাগা-বস্তী কোহিমা, ইম্‌ফল-ডিমাপুর মোটর-রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত, এর লোকসংখ্যা প্রায় চার হাজার। রাস্তার অন্য দিকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসারি হিল, হস্‌পিটাল হিল, জেল হিল, সামার হাউস হিল ইত্যাদি ছোট ছোট পাহাড়ের মালা।

বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলপথে লামডিং থেকে তিনসুকিয়া পর্য্যন্ত যে-কয়টি বড় ষ্টেশন আছে মণিপুর রোড্ তন্মধ্যে একটি। এখান থেকে উক্ত রেলপথে কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলা অতিক্রম ক'রে বাংলাদেশে আসা যায়।

ডিমাপুর-ইম্‌ফল মোটর-রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ার আগে যে-রাস্তাটি ছিল ভারতবর্ষের সঙ্গে ইম্‌ফলের একমাত্র যোগ-সূত্র এইবার তার কথা উল্লেখ করব। এবারকার যুদ্ধের কল্যাণে ১২৪ মাইল দীর্ঘ বিষেণপুর-শিলচর রাস্তাটি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ-রাস্তায় বিষেণপুর থেকে লখীপুর হয়ে শিলচরে পৌছতে হয়। আগেকার দিনে এ পথে লখীপুর থেকে ইম্‌ফল পর্য্যন্ত যাতায়াত ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। বড়লাট লর্ড কার্জ্জন যখন ইম্‌ফল পরিদর্শন করতে যান, তখন এই রাস্তা দিয়েই একখানা ডুলিতে করে তাঁকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বিষেণপুর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুই হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। ইম্‌ফল থেকে মোটরে বিষেণপুর হয়েই লোগতাক হ্রদে যেতে হয়। মইরাং নামক স্থানটি—এখানেও জাপানীদের সঙ্গে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের যুদ্ধ হয়েছিল—বিষেণপুর থেকে দশ মাইল দূরে লোগতাক হ্রদের তীরে অবস্থিত। বিষেণপুর হয়েই বিভিন্ন দিকে রাস্তাসমূহ মণিপুরের বাইরে চলে গেছে। এইজন্যেই কেউ কেউ বিষেণপুরকে মণিপুরের চৌরঙ্গী বলে উল্লেখ ক'রে থাকেন।

এবারকার যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী যখন ইম্‌ফলের সমতলে এল তখন বিষেণপুর-শিলচর রাস্তাটিকে সৈন্য-চলাচল এবং সমরোপকরণ সরবরাহের উপযোগী করবার সংকল্প ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারীদের মনে জাগল। কিন্তু অভিজ্ঞ ইঞ্জীনিয়ারগণ রাস্তার দুর্গমতা দেখে বললেন যে তাঁদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন চ্যাপফোর্সের অধিনায়ক

লেফটেনাণ্ট কর্ণেল চ্যাপম্যান। নাগা-মজুরদের সহায়তায় তিনি বিষেণপুর থেকে লখীপুর পর্য্যন্ত সমরোপকরণবাহী 'জিপ' চলাচলের উপযোগী সুরম্য রাজপথ নির্ম্মাণ করলেন। নাগাদের দ্বারা এ 'লাম্পি' (রাজপথ) নির্ম্মাণের চিত্তাকর্ষক কাহিনী চ্যাপম্যান তার সদ্য-প্রকাশিত লাম্পি নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা লাম্পির কথা বর্ণনা করব। এ পথে এখন মিত্রপক্ষের চতুর্দ্দশ সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি।

প্রায় সাড়ে তিন মাস আগে সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করবার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে জাপানীরা মাত্র তিন ডিভিসন সৈন্যসহ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরধিগম্য প্রদেশের ভিতর দিয়ে আক্রমণাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ইম্‌ফলের ভিতর দিয়ে অভিযান চালনা করবার মূলে ছিল তাদের নিম্নোক্ত চারিটী উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ—ইম্‌ফল দখল করা, দ্বিতীয়তঃ—ডিমাপুর রেলষ্টেশন দখল করে জেনারেল ষ্টিলওয়েলের উত্তর ব্রহ্মস্থ সৈন্যবাহিনীর রেলওয়ে সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া, তৃতীয়তঃ—আসাম প্রদেশের সর্ব্বত্র সংস্থাপিত মিত্রপক্ষের বিমান-ঘাঁটি-সমূহ একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা এবং চতুর্থতঃ—ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ যে-ভূখণ্ড এখন ব্রহ্মদেশে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম পরিচালনা এবং চুংকিংএ সরবরাহের কেন্দ্র তা করতলগত করা।

জাপানীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে খুব দ্রুত গতিতে অভিযান পরিচালনা ক'রে স্বল্পকাল-মধ্যে, পাহাড়ে বর্ষা নামবার আগেই তারা তাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করতে পারবে। সেইজন্যই মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি জাপানী সৈন্যেরা ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে ব্রহ্মদেশের চিন্দুইন নদী অতিক্রম ক'রে ঝড়ের গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ১৭ই মার্চ্চ চিন পাহাড়ে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৬ই ও ১৭ই মার্চ্চ জাপানীদের কতকগুলি বিমান ইম্‌ফল অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করে। এই সময় আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে তাদের মধ্যে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। একদল জাপানী সৈন্য মণিপুরের ভিতর দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ডিমাপুর-ইম্‌ফল

রাস্তাটি দখল করাই তাদের উদ্দেশ্য। এই সময় থেকেই টিড্ডিম টামু এবং বিশেষভাবে ইম্‌ফলের পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ ক'রে মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে জাপানীরা ইম্‌ফলের সমস্ত রাস্তা বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয় এবং সম্পূর্ণভাবে ইম্‌ফল অবরোধ করে।

২৪।২৫ মার্চ্চ ইম্‌ফলের উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ উখরুল নামক স্থানে জাপানীরা মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের আক্রমণ করে। ২৫শে মার্চ্চ টিড্ডিম-ইম্‌ফল রোডে তারা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। এবার ক্রমে ক্রমে তারা নাগাপাহাড়ের প্রধান শহর কোহিমার দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং মার্চ্চের একেবারে শেষ দিকে ইম্‌ফলের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়ে হানা দেয়। নিউ দিল্লী থেকে প্রকাশিত ২৯শে এপ্রিলের সমর-বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় যে, ঐ সময় উখরুল অঞ্চলে জাপানীদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৯শে মার্চ্চ একদল জাপানী অভিযানকারী কোহিমা রোডে গিয়ে হানা দেয় এবং রাস্তার ওপরকার একটা সেতু ভগ্ন করে। এই সময় জাপানীদের প্রধান উদ্দেশ্য হয় কোহিমাতে প্রবেশ করা। সেজন্য উখরুলের উত্তরে কোহিমার পথে তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়। মার্চ্চের একেবারে শেষভাগে তারা কোহিমার ২৮ মাইল দক্ষিণে এক জায়গায় কোহিমা-ডিমাপুর রাস্তা বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। ৫ই এপ্রিল নিউ দিল্লীর সমর-ইস্তাহারে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, ইতিমধ্যে জাপানীরা ইম্‌ফল এবং কোহিমার মধ্যবর্ত্তী খানিকটা জায়গা দখল করেছে। ঐ সময় তারা নূতন সৈন্য আমদানি ক'রে মরীয়া হয়ে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের আক্রমণের তোড়জোড় করতে থাকে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইম্‌ফল আক্রমণের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ ক'রে কোহিমা দখল করবার এবং মণিপুর রোড পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে রেললাইনের ধ্বংস-সাধনের উদ্দেশেই তারা নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করবার সঙ্কল্প করেছে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মেজর জেনারেল ডেভিড-টেনাণ্ট কাউয়ানের অধীনে মিত্রপক্ষের সপ্তদশ-বাহিনী তিন সপ্তাহ যুদ্ধ করতে করতে পথে

জাপানী ঘাঁটিসমূহ নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময়েই জাপানীদের তোড়জোড় থেকে বুঝতে পারা যায় যে, শীঘ্রই কোহিমা শহরের উপর তারা তাদের প্রথম ও প্রধান আক্রমণ সুরু করবে। কোহিমার উপর বিপদ আসন্ন বলেই মনে হয়। কিন্তু কোহিমাতে জাপানীদের অবস্থা ইম্ফলের চেয়ে কতকটা অনুকূল বলে প্রতীয়মান হয়।

৭ই এপ্রিল তারিখে নিউইয়র্কের "টাইমস্" কাগজের সমর-সম্পাদক হ্যান্সল বল্‌ডুইনের নিম্নোক্ত বিবৃতিটী প্রকাশিত হয়—"পর্য্যুদস্ত হলেও জাপানীরা এখনো ধ্বংস হয় নি। গত কয়দিন যাবৎ অবশ্য ব্রিটিশের প্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু, শত্রুর গতি এখনো প্রতিহত হয় নি। ইম্ফল, কোহিমা, ডিমাপুর এবং সর্ব্বোপরি বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশঙ্কার হেতু এখনো বিদ্যমান। আসামের সর্ব্বপ্রধান সরবরাহ রেল-পথ বিচ্ছিন্ন করতে না পারলেও শত্রু ইম্ফলের সরবরাহ্-পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, সে এখন কোহিমার উপকণ্ঠে উপস্থিত। ডিমাপুরের ওপরেও বিপদের সম্ভাবনা বিদ্যমান।"

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোহিমা শহরে আসাম রণাঙ্গনের বৃহত্তম এবং প্রচণ্ডতম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সংগ্রামের তীব্রতা একেবারে চরমে গিয়ে পৌছে। এদিকে আবার ১২ই এপ্রিল তারিখে বিষেণপুর-শিলচর রাস্তার (লাম্পি) আশে-পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাপ-বাহিনীর সঙ্গে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের লড়াই হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই বিষেণপুরের পশ্চিমে বিষেণপুর-শিলচর রাস্তার দক্ষিণ অংশে সংগ্রামের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে বিষেণপুর রাস্তার নিকটে উভয় পক্ষে হাতাহাতি সংগ্রাম হয়।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কোহিমা এবং ইম্ফল উভয় অঞ্চলেই যুদ্ধের অবস্থা মিত্রপক্ষের অনুকূল হয়। মিত্র[illegible]ন্যগণ ইম্ফল থেকে উখরুল রোডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

মে মাসের প্রথম দিকে ইম্ফল রণাঙ্গনে উভ[illegible]সৈন্যদের মধ্যেই নিশ্চেষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। ৪ঠা মে তারিখে ইম্ফল থে

লেখেন—"আজ পর্য্যন্ত এই সুবিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে প্রকৃতপক্ষে কোনো বড় রকমের যুদ্ধ হয়ই নাই। এখানে শুধু পাহাড় এবং জঙ্গলেই যুদ্ধ চলছে। এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মহাযুদ্ধের এই পঞ্চম বৎসরে যখন অন্য সমস্ত রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষ জয়লাভ করছে তখন কেবলমাত্র এই আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গনেই যুদ্ধের অবস্থা আমাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হচ্ছে না। তবে আশার কথা এই যে, যেমন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান তার সংকল্পিত ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হতে সক্ষম হয় নাই তেমনি এবার সে ইম্ফল দখল ক'রে আমাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করতে বা মগাউং উপত্যকায় জেনারেল ষ্টিলওয়েলের সৈন্য-বাহিনীর সরবরাহ রেলপথ বিচ্ছিন্ন করতেও পারে নাই। ডিমাপুর-কোহিমা রণাঙ্গনের অবস্থা মার্চ্চে এবং এপ্রিলে ছিল আমাদের পক্ষে নৈরাশ্যপ্রদ। কিন্তু গত দু' সপ্তাহ ধরে অবস্থা অনেকটা আমাদের অনুকূল হয়েছে। শত্রু কোহিমার চতুষ্পার্শ থেকে বিতাড়িত।"

১৫ই মে তারিখে কোহিমা রণাঙ্গন থেকে এ, পি, আই-এর সমর সংবাদ-দাতা ডি, আর মানকেকার লেখেন,—"জাপ-বাহিনীকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গনের বৃহত্তম যুদ্ধ—কোহিমা পর্ব্বতের যুদ্ধ—শেষ হয়েছে। এখন সমস্ত কোহিমা পাহাড়ই আমাদের দখলে। কোহিমার যুদ্ধকেই আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গনের একমাত্র প্রচণ্ড সংগ্রাম বলা চলে। উভয় পক্ষই মরণ পণ করে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছে চল্লিশ দিন। শত্রুপক্ষের প্রায় তিন হাজার সৈন্য হত হয়েছে।"

মে মাসের শেষ দিকে জাপানীরা ইম্ফলে, বিশেষতঃ বিষেণপুর অঞ্চলে, নূতন সৈন্য আমদানি করে। ২৬শে মে তারিখে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনী ইম্ফলের দক্ষিণ দিকস্থ মইরাং নামক স্থানের দক্ষিণে অবস্থিত এক শত্রু-ঘাঁটি দখল করে।

জুনমাসের প্রথমভাগে সমগ্র আসাম-ব্রহ্ম রণাঙ্গণে প্রবল ভাবে বারিপাত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ-বিরতির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বুঝতে পারা গেল যে, ইম্ফল এবং কোহিমার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে সমগ্র বর্ষাকালটা কাটিয়ে দেওয়াই জাপানীদের অভিপ্রায়। এদিকে কোহিমা অঞ্চলে পর্য্যুদস্ত এবং মারাত্মক ভাবে

ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় জাপানীরা দ্রুত সে অঞ্চল পরিত্যাগ করে যেতে লাগল। অমৃতবাজারের সমর সংবাদ-দাতার ৮ই জুনের পত্রে দেখা যায় যে, কোহিমা সম্পূর্ণরূপে শত্রু-মুক্ত হয়েছে। ১২ই জুন ইমফলের নিং-থৌ-খং অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ প্রতি-আক্রমণ করে জাপ অধিকৃত স্থান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই কোহিমা-ইম্ফল রাস্তার অধিকাংশ জাপানীদের কবলমুক্ত হয়।

২২শে জুনের সংবাদপত্রে এই বিবরণ প্রকাশিত হ'ল যে আসামে জাপ-অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে ইম্ফলের অবরোধ-মুক্তি ঘটেছে, মণিপুর ব্যতীত আসামের সকল স্থান থেকে জাপানীরা বিতাড়িত। তারা উখরুলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ দখল করবার জন্যে জাপানীরা যে দুঃসাহসিক অভিযান আরম্ভ করেছিল ছোট ছোট চারিটি মাত্র মিত্র-সেনাদলের প্রতি-বন্ধকতায় তা ব্যর্থ হ'ল। ডিমাপুর দখলের জন্যে জাপানীরা মার্চ্চ মাসে দ্বিমুখী অভিযান চালিয়েছিল। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ প্রাণপণে গতিরোধ ক'রে তাদের অভিযানের সময়-তালিকা পিছিয়ে না দিলে তারা ডিমাপুর পৌঁছে রেলপথ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে পারত। ভারত অভিযানে জাপানীদের সাফল্য নির্ভর করছিল তাদের দ্রুত গতির ওপর। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় সেনাদল কর্ত্তৃক তাদের গতি ব্যাহত হওয়ায় তাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হ'ল না।

কোহিমা রোড উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল ইম্ফল যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায়। ওদিকে জেনারেল ষ্টিলওয়েলের বাহিনী মগাউং উপত্যকা দখল করল।

আসামের অন্যান্য স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে জাপানীরা মণিপুরের আশে পাশে আক্রমণ সুরু করল। ২৩শে জুনে বিষেণপুর অঞ্চলে জাপানীরা চ্যাপম্যানের তত্ত্বাবধানে নাগাদল কর্ত্তৃক বহু যত্নে নির্ম্মিত লাম্পি বিধ্বস্ত করে দিল। এদিকে ডিমাপুর ইম্ফল সড়ক আবার মিত্র-বাহিনীর হস্তগত হ'ল।

এ, পি, আই-এর সমর-সংবাদদাতা মিঃ রেমণ্ড ওকেলির প্রদত্ত বিবরণে

দেখা যায়, জাপানীরা প্রায় ৬২০০০ সৈন্য নিয়ে ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিল তন্মধ্যে বিগত সাড়ে তিন মাসে প্রায় ১৩৷১৪ হাজার হত হয়েছে।

কাণ্ডির ২৪শে জুনের সমর-বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ,—বিষেণপুর অঞ্চলে জাপানীদের ইঁদুরের মত গুলি করে মারা হচ্ছে। কিন্তু এত সৈন্য হত এবং এরূপ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও জাপানীরা এখনো ইম্‌ফল রণাঙ্গনে সংগ্রাম চালাচ্ছে। ইম্‌ফল সড়ক, উখরুল সড়ক, বিষেণপুরের 'লাম্পি' স্তূপীকৃত জাপানী সৈন্যের মৃতদেহে পরিপূর্ণ, তাদের সমরোপকরণ মিত্রপক্ষের হস্তগত। কিন্তু তাদের মণিপুর পরিত্যাগ করবার লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। মণিপুর বিপদ্‌মুক্ত হয়েছে একথা এখনো বলা চলে না। জুলাইএর প্রথম সপ্তাহ শেষ হতে চলল এখনো উখরুলের উত্তর উপকণ্ঠে জাপ সৈন্য মিত্রবাহিনীব আক্রমণ তীব্রভাবে প্রতিহত করছে, বিষেণপুরের দক্ষিণে তাদের কর্ত্তৃত্ব এখনো অক্ষুণ্ণ।

কবে যে নিভৃত, রমণীয় ইম্‌ফল উপত্যকার শান্তিপূর্ণ দিনগুলি আবার ফিরে আসবে, পাহাড়ের ছায়ানিভৃত লাম্পি আবার স্বচ্ছন্দবনচারিণী নাগা মেয়েদের উচ্চ হাস্যে মুখরিত হয়ে উঠবে তা বলা কঠিন। মনে হচ্ছে যে, মণিপুরে যুধ্যমান জাতিদের হনন-কার্য্য আরও কিছুকাল স্থায়ী হবে।

৬ই জুলাই, ১৯৪৪

লাম্পি*

আমরা তখন ডিমাপুর বা মণিপুর রোড্ ষ্টেশন থেকে আট-নয় মাইল দূরে নীচুগার্ড নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন কেবল চিন্দুইন নদীর তীর ছাড়া শত্রুর গতিবিধির কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না।

ঐ সময় একদিন মানচিত্রে খোপাম উপত্যকার দৃশ্য নজরে পড়বামাত্রই আমার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। মনে হ'ল, পাহাড়ে-ঢাকা এ উপত্যকা আমাদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। শক্তি সংহত ক'রে আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার সুযোগ এবং সুবিধা শত্রুপক্ষের এ-জায়গায় প্রচুর। তখন থেকেই এ-উপত্যকা পরিদর্শন করবার সঙ্কল্প আমার মনে জাগল। ৯ই জুন তারিখে (১৯৪২ খ্রীঃ) নীচুগার্ড থেকে ইম্‌ফল ডিভিসন্যাল হেড্ কোয়ার্টারে ফিরে এসেই সেখানকার জেনারেলকে আমি আমার সঙ্কল্পের কথা জানালাম।

জেনারেলের হুকুমে আমি আমার নূতন সৈন্যদল নিয়ে নীচুগার্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। এই সৈন্যবাহিনীর নাম হ'ল 'চ্যাপ ফোর্স'।

ডিমাপুর থেকে ইম্‌ফল যাবার পথে নীচুগার্ডই হচ্ছে প্রথম গেট। এই ১৩৫ মাইল ব্যাপী ডিমাপুর-ইম্‌ফল রাস্তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। পাহাড়ের ওপর দিয়ে ক্রমোচ্চভাবে রাস্তাটি চলে গেছে, কোনো কোনো জায়গায় এই দুর্গম বন্ধুর গিরি-পথের উচ্চতা ছয় হাজার ফুট। একদিকে তার উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, অন্যদিকে সুগভীর খাদ। তখন, আশ্রয়-প্রার্থীরা দলে বলে ব্রহ্মদেশ থেকে এই রাস্তা দিয়ে পালিয়ে আসছে। কলেরা, আমাশয়, ইত্যাদি নানা ব্যাধি এবং অনাহারে দীর্ঘপথ পর্য্যটন এ-সমস্ত নানা কারণে দলে দলে লোক মরছে, স্তূপীকৃত মৃতদেহে রাস্তা সমাচ্ছন্ন।

---

* 'চ্যাপফোর্সে'র অধিনায়ক লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল জি, পি, চ্যাপম্যান ডি, এস, ও, এম, সি, আর-এর The Lampi নামক সদ্য-প্রকাশিত পুস্তক অবলম্বনে এ অধ্যায়টি লিখিত।

"লাম্পি" কথাটা নাগাভাষার শব্দ, মানে রাজপথ।

রোজ কত যে মোটর শত-শত ফুট নিম্নে খদে গড়িয়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেত তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। তা ছাড়া আর এক বিপদ। পাহাড় ধ্বসে রাস্তা প্রায়ই বন্ধ হয়ে যেত। সেইজন্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে যান-বাহন এবং সৈন্য-চলাচল বন্ধ থাকত।

এই বাধা-বিপত্তি এবং প্রতিকূলতার দরুনই আমার মনে জাগল ইম্‌ফলের সমতলে সৈন্য-চলাচল এবং সমরোপকরণ সরবরাহের জন্যে ইম্‌ফল থেকে শিলচর পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা।

ইম্‌ফলের আঠারো মাইল দক্ষিণে ছোট একটি পল্লী, নাম তার বিষেণপুর। এখান থেকে কখনো পাহাড়ের ওপর দিয়ে, কখনো নিবিড় অরণ্য আর বাঁশবনের ভেতর দিয়ে, কখনো বা গিরি-নদীর কাছ ঘেঁষে একটি আঁকাবাঁকা, সঙ্কীর্ণ পাহাড়ে রাস্তা বরাবর পশ্চিম দিকে পঁচাশি মাইল দূরবর্ত্তী জিরিঘাট পর্য্যন্ত চলে গেছে। জিরিঘাট মণিপুরের পশ্চিমদিকস্থ কাছাড় জেলার প্রধান শহর শিলচর থেকে আটাশ মাইল দূরে অবস্থিত।

২৫শে জুন ডিভিসন্যাল হেড্ কোয়ার্টার্সের এক কন্‌ফারেন্সে জেনারেল আমাকে দলবল নিয়ে খোপাম উপত্যকা পরিদর্শনের এবং সম্ভব হ'লে শিলচর পর্য্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে নিদেনপক্ষে অশ্বতর বা গরুর গাড়ী দ্বারাও ইম্‌ফলে রসদপত্রাদি আনানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার অনুমতি দিলেন।

৪ঠা জুলাই সকালে আমি এবং হেরল্ড ওয়েষ্ট ষোলো জন ব্রিটিশ এবং নয় জন ভারতীয় সৈন্য, একুশটি অশ্বতর এবং দুইটি 'জিপ'* সহ রওনা হলাম। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত খোপাম উপত্যকা পরিদর্শন করতে পারব ভেবে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লাম।

---

* 'জিপ' হচ্ছে এক অদ্ভুত ধরণের ছোট চতুশ্চক্রযান। যুদ্ধোপকরণাদি সরবরাহের পক্ষে এগুলো অত্যাবশ্যক। এগুলো নিয়ে সব জায়গাতেই যাওয়া চলে, যে কোনো-কিছুর ওপর 'জিপ' স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে। এগুলোকে সচল রাখবার জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। এক একটি কমপক্ষে অর্দ্ধ টন জিনিষ বহন করতে পারে।

প্রায় দশ মাইল রাস্তা অতিক্রম ক'রে আমরা তাইরেনপক্পি নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম। সারাটা দিন সেখানেই কাটল। ৬ই জুলাই আবার আমাদের যাত্রা স্থরু হ'ল। সেদিন সার্জ্জেণ্ট বোথাকে নিয়ে ৩৮ মাইলষ্টোনের নিকট উচ্চ গিরিচূড়ায় আরোহণ করলাম। বহুনিম্নস্থ নীলাভ বনানীমণ্ডিত পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মরকতশ্যাম তৃণাচ্ছাদিত খোপাম উপত্যকার সহিত সেই আমার প্রথম পরিচয়। সমাধিক্ষেত্রের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা যেন তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। কি ভীষণ-রমণীয় দৃশ্য!

সে-রাত্রে আমরা তেতাল্লিশ মাইলষ্টোনের নিকটে শিবির স্থাপন করলাম, কি ভয়ানক জোঁকের উৎপাত এখানে। পরদিন বেলা দুটোর সময় রওনা হয়ে আমরা পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী লাগাইরং নামক স্থানের 'রেষ্ট-হাউসে' গিয়ে পৌঁছলাম।

৮ই জুলাই তারিখে আলাপ-আলোচনা ক'রে আমরা স্থির করলাম, এখান থেকে শিলচর পর্য্যন্ত বাকী রাস্তাটুকু তদারক করবার জন্যে ওয়েষ্টকে পাঠানো হবে। খোপাম উপত্যকা পরিদর্শনের পরই আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছি। বিষেণপুর থেকে লাগাইরং পর্য্যন্ত 'জিপ' চলাচলের উপযোগী রাস্তা নির্ম্মাণ আমি করবই। আর যদি ওয়েষ্ট আশাপ্রদ খবর নিয়ে ফিরে আসে তা হ'লে চাই কি একেবারে শিলচর পর্য্যন্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করাও সম্ভব হতে পারে।

ইম্ফলে ফিরে এসে জেনারেলকে আমি বললাম,—"আমার অন্ততঃ একশো সৈন্য চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, চার সপ্তাহের মধ্যে আমি বিষেণপুর থেকে খোপাম উপত্যকা পর্য্যন্ত জিপ চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করতে পারব। আর এ উপত্যকার ভেতর দিয়ে লাগাইরং পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করতে লাগবে আরো তিন সপ্তাহ।"

সব ঠিকঠাক। এমন সময় অকস্মাৎ একজন ইঞ্জিনীয়ারের রিপোর্ট এসে পৌঁছল। তিনি লিখেছেন—"এ দুর্গম দুরারোহ পার্ব্বত্য পথকে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা মানুষের সাধ্যের অতীত।" এতে কিন্তু আমার উৎসাহকে দমাতে পারলে না। আমি আমার সঙ্কল্পে অবিচলিতই রইলাম।

১৪ই জুলাই আমি ইয়ংকে বিষেণপুরে এবং রজার্স এবং মসম্যান্‌কে ২২ মাইল দূরে মজুর সংগ্রহ করবার জন্যে পাঠালাম। ১৯শে জুলাই পর্য্যন্ত পঞ্চাশ জন মজুর যোগাড় হ'ল। নানা জরুরি কাজে ব্যাপৃত থাকায় আমার পক্ষে অবশ্য ২৮শে জুলাই-এর আগে ইম্‌ফল পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হয় নি। ইতিমধ্যে কিন্তু রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ খানিকদূর অগ্রসর হয়েছিল। মস্‌ম্যান ইম্‌ফল থেকে বিষেণপুরের পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী ৫৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত একটা কাজ-চলা-গোছের রাস্তা নির্ম্মাণ করতে সক্ষম হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি ইম্‌ফলের সমতল পরিত্যাগ ক'রে পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। ক্যাম্পবেল আমার আগেই পাহাড়ে গিয়ে তাইরেনপক্‌পি 'রেষ্ট-হাউসে' হেড্‌ কোয়ার্টার্স স্থাপন করেছিল। মসম্যান্‌ও সেখানেই অবস্থান ক'রে বিষেণপুর গিরি-শৃঙ্গ থেকে তাইরেনপক্‌পি পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ স্থরু ক'রে দিয়েছিল।

২৮শে জুলাই তারিখটি আমাদের রাস্তা নির্ম্মাণের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। সেদিন অপরাহ্নকালে আমি আমার 'জিপ'খানা নিয়ে গিরি-শিখরে গিয়ে পৌঁছলাম এবং স্থির করলাম যে, সেখান থেকে জিপ চালিয়ে সরাসরি একেবারে তাইরেন-পক্‌পিতে গিয়ে পৌঁছব। সার্জ্জেণ্ট বোথা ছিল আমার সঙ্গে। এই দুরতিক্রম্য বন্ধুর পার্ব্বত্য পথের ওপর দিয়ে আমার জিপ চালানোর সঙ্কল্পের কথা শুনে আমার দিকে সে এমনভাবে তাকালে যে, মনে হ'ল যেন সে আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করছে। ইতিমধ্যে ক্যাম্পবেলও এসে পৌঁছল। আমরা তিন জনে জিপে চড়ে রওনা হলাম। ২৪ মাইলষ্টোনের নিকটে এসে দেখি স্থমুখে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক গড়ানে গণ্ডশৈল। এর ওপর দিয়ে জিপ চালানো তো কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন কি করা যায়? অগত্যা আমরা তিনজনে ধরাধরি করে জিপটাকে নিয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে এই গণ্ডশৈলের ওপর আরোহণ করতে লাগলাম। এক একবার মনে হতে লাগল বুঝিবা আমরা পা পিছলে জিপসুদ্ধ গভীর খদে পড়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

অবশেষে বহু আয়াসে পাহাড় অতিক্রম করা গেল। এই ক্ষুদ্র শৈল আমাদের সকল আশার সমাধি রচনা করবার উপক্রম করেছিল। আমাদের অগ্রগতির পথে এ যেন একটা মূর্ত্তিমান দুঃস্বপ্নের মত আচম্‌কা এসে দেখা দিয়েছিল। আমরা এর নামকরণ করলাম "বোথার পাহাড়"। "বোথার পাহাড়"কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে আমাদের লাগল পুরো চারটি সপ্তাহ। শাবল, কোদাল, দা এবং হাতুড়ির ঘায়ে সাতশো যাট টন শক্ত পাথর একেবারে চুরমার হয়ে গেল, তৈরি হ'ল পাহাড়ের ওপর দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাজপথ। এর ওপর দিয়ে কোনো কালে যে যান-বাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তা নির্ম্মিত হতে পারে তা ছিল ইঞ্জিনীয়ারদের কল্পনারও অতীত।

এর পর একটা কন্‌ফারেন্সে যোগদান করবার জন্যে আমি ইম্‌ফলে ফিরে এলাম। সেইদিনই রাত আটটার সময় টেলিগ্রামে এক দুর্ঘটনার সংবাদ জানতে পেরে তাইরেনপক্‌পির উদ্দেশে রওনা হলাম।

* * * * *

কাজ এগিয়ে চলেছে পুরোদমে। নাগারা দলে দলে এসে মজুরের কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে রাস্তা নির্ম্মাণের বেশীরভাগ কাজ তারাই করছে। তাদের সহায়তা ছাড়া আমাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হওয়া ছিল অসম্ভব। সারাদিন অবিশ্রান্ত খাটুনির পর একটিমাত্র টাকা আর এক মুঠো লবণ পেলেই তারা সন্তুষ্ট। প্রথম প্রথম আমাদের দেখলেই নাগা-মেয়েরা জঙ্গলের ভেতর ছুটে পালাত। এখন, তাদের ভয় টুটে গেছে। গোরা সৈন্য তাদের নিকট অদৃষ্টপূর্ব্ব, আজব চীজ্‌, তাই দলে দলে তারা আমাদের সৈন্যদের ছাউনির পাশে এসে জমায়েৎ হয়। নাগা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ভারি সরল আর সৎপ্রকৃতি। আমার সৈন্যরা ভুল ক'রে রাস্তায় কিছু ফেলে এলে তারা তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে এসে হাজির হয়। কেউই নিজের মজুরির চেয়ে একটি পয়সাও বেশী দাবী করে না। এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

গ্রামোফনের গান তাদের নিকট এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। সন্ধ্যার পর যখন আমাদের সৈন্য-শিবিরে গ্রামোফোন বাজতে থাকে তখন তারা আহার নিদ্রা, বাড়ীঘরের কথা সব ভুলে গিয়ে তন্ময় হ'য়ে গান শোনে। নারীকণ্ঠের সঙ্গীতই তাদের বেশী পছন্দসই, যদিও গায়িকাটি যে কি ক'রে এই ছোট্ট বাক্সটির ভেতরে গিয়ে ঢুকল সে তাদের নিকট এক রহস্য !

কেন যে আমরা পাহাড়-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে 'লাম্পি' তৈরি করছি, তা তাদের বুদ্ধির অগম্য। তবে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনামত এটুকু তারা বুঝে নিয়েছে যে, এই সব গোরা সৈন্যরা দৈনিক একটাকা রোজগারের জন্যেই উদয়াস্ত খেটে লাম্পি তৈরি করছে। আর একথাও তারা জানে যে, 'লাম্পি' তৈরির কাজ চালাতে হবে পূর্ণোদ্যমে, নিজেদের সমস্তটুকু শক্তি দিয়ে।

* * *

রাস্তার কাজ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে। সোয়া একত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী লেইমাটক নদীর ধারে 'রিভার ষ্টেশন' স্থাপিত হয়েছে। ৩রা আগষ্ট নাগাদ ব্রাউন ৩৮ মাইলষ্টোনের নিকটে ৩০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ে রাস্তা নির্ম্মাণের জন্যে গিয়েছে। সেখানে কোন নাগা বস্তী না থাকায় ব্রাউনের পক্ষে কুলি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হ'ল না। কিন্তু ব্রাউন আর আমাদের সৈন্যদল তাতে প্রতি-নিবৃত্ত না হয়ে নিজেরাই কাজ করে যেতে লাগল। আমি বার্ত্তা-বাহক মর্গের মারফতে খবর পাঠালাম যে, ১৭ই আগষ্ট তারিখে আমি এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।

১৭ই তারিখে ব্রাউন এবং সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে পর্ব্বতের উপরে স্থিত প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু এক পাষাণ-প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঠিক গির্জ্জার সিঁড়ির মত নৈসর্গিক প্রস্তর-সোপানগুলো ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। এখানে যে 'বোথার পাহাড়ের' চেয়েও গুরুতর আর এক প্রতিবন্ধক। সৈন্যরা জায়গাটিকে লাউসি লিজ্জি বলে অভিহিত করলে। উক্ত নামেই তা পরিচিত হয়ে রইল।

এখন এই লাউসি লিজ্জিকে নিয়ে কি করা যায় তাই হ'ল সমস্যা। এটাকে ধূলিসাৎ না করা পর্য্যন্ত তো জিপ সহ আমাদের অগ্রগমন অসম্ভব।

আমরা সবাই মিলে লাউসি লিজ্জির ধ্বংস-লীলায় মেতে উঠলাম। আমাদের কোদাল আর শাবলের ঘায়ে তার পাষাণ-গাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। গিরিসানুদেশ আকীর্ণ হয়ে গেল অজস্র প্রস্তরখণ্ডে। সেগুলো সংগ্রহ করে আমরা একধারে স্তূপীকৃত ক'রে রাখলাম। পথের বাধা অপসারিত হ'ল, স্থরু হ'ল ১৮ই আগষ্ট থেকে লাউসি লিজ্জির ওপর দিয়ে 'জিপ' চলাচল। আজ তার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি মোটর এবং 'জিপ' ড্রাইভারদের আশ্বাস প্রদান করে।

নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে পথ কেটে কেটে অবশেষে আমরা খোপাম উপত্যকাতে এসে পৌছলাম। একদিন রমণীয় অপরাহ্ন কালে প্রথম আমি 'জিপ' চালিয়ে উপত্যকা-ভূমির ওপর দিয়ে রওনা হলাম। দেখেই নাগারা ধানক্ষেতের ভেতর গা-ঢাকা দিলে। এখন সমস্যা দাঁড়াল, কেমন ক'রে তিন-চার মাইল ব্যাপী কর্দ্দমাক্ত জমির ওপর দিয়ে জিপ চালানোর ব্যবস্থা করা যায়।

উপত্যকার স্থদূর প্রান্তে আমাদের দুটি নাগা বন্ধু জুটল, একজনের নাম প-চুন-লুং, সে লাগাইরং গ্রামের সর্দ্দার। আরেক জনের নাম আকুম্বা, সে প্রসিদ্ধ খোপাম গ্রামের মোড়ল। এরা দুজনে আমাদের আড়াইশোরও অধিক কুলী জোগাড় করে দিলে। প্রায় তিন সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করে তারা সেই কর্দ্দমময় জমির ওপর (তেতাল্লিশ থেকে সাড়ে ছেচল্লিশ মাইলষ্টোন্ পর্য্যন্ত) তিন ফুট উঁচু চওড়া বাঁধ নির্ম্মাণ করলে। তার ওপর দিয়ে জিপ চলল অবলীলাক্রমে। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে এই বাঁধ নির্ম্মাণ তারই নিদর্শন।

কি অপূর্ব্বসুন্দর এই খোপাম উপত্যকা! এর পশ্চিম প্রান্তে শৈলশিখরে অবস্থিত লাগাইরং 'রেস্ট হাউস' থেকে যে রমণীয় দৃশ্য দেখা যায়, বুঝি তার তুলনা নাই। এখানকার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের দৃশ্য কি মহান্, কি গরিমাময়! কেন জানি না এই নিভৃত শৈল-নিবাস থেকে দূরে অস্তগামী সূর্য্যের পানে তাকিয়ে চোখ দুটি আপনা থেকেই জলে ভরে ওঠে।

এই রাস্তা নির্ম্মাণের মূলে রয়েছে খোপাম উপত্যকা। বহুদিন আগে মানচিত্রে এ জায়গাটি দেখেই এ সঙ্কল্প আমার মনে জেগেছিল।···নির্জ্জন গিরিপথের ওপর দিয়ে নৈশ নিস্তব্ধতা ভগ্ন করে জিপ চালিয়ে চলেছি। দূরে শৈল-শিখরে আলোর রেখা নজরে পড়ছে। ঐ তো বিশ্রাম-গৃহ, আর বেশী দূরে নয়। দিনের কাজ শেষ হ'ল। এখন বিশ্রামের জন্যে সমস্ত অন্তর ব্যাকুল। আর একটু পরেই তো আলোকোজ্জ্বল 'রেস্ট হাউসে' পরিপূর্ণ বিশ্রাম,—সঙ্গীতানন্দ উপভোগ। আলোর রেখা ক্রমেই যেন কাছিয়ে আসছে। এবার আমরা গিরিগাত্রস্থ নিবিড় অরণ্যের ভেতর এসে প্রবেশ করেছি, গাছপালার আড়ালে আলোর রেখা এখন অদৃশ্য-প্রায়। আর বেশী দূরে নয়, মাত্র মাইলখানেক বাকী। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে ডাকবাংলায় এসে পৌছলাম। সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো আলো হাতে বহুলোকের আগমন, সাদর অভ্যর্থনা, প্রাণখোলা উচ্চহাস্য, বহু কণ্ঠের সম্মিলিত প্রশ্ন-বাণ—"এত দেরি হ'ল কেন"? "আপনি কি জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন?" "জিপ কেমন চলল?" ····

খোপাম এখন আমাদের অতি প্রিয় নিকেতন। যদি প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হতে চাও, তাহ'লে পাহাড়ে ওঠে একবার নীচেকার উপত্যকার পানে তাকিয়ো। জ্যোৎস্নারাত্রে কিন্তু খোপামের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ো। জ্যোৎস্নারাত্রে যাদুকরী খোপাম মায়া-মন্ত্রে মনকে ভুলিয়ে যেন পথের সীমা-রেখা ছাড়িয়ে কোন্ সুদূর দেশে নিয়ে যেতে চায়।······

আলো মিলিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। এবার চলেছি অন্য পথে। বিদায়, উপত্যকা! বিদায় বন্ধু, বিদায়!···

এমনিভাবে আগস্ট গেল, সেপ্টেম্বর এল। পথের কাজ তো এখনো শেষ হ'ল না। কবে? কবে আমরা আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত করতে পারব?

আমাদের সৈন্যরা সব নাগাদের নিয়ে পথ তৈরি করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল। তৈরি পথে চলা তো তাদের নয়, তারা চলেছে পথ তৈরি করতে করতে।

সকালবেলা চলে যায় তারা দূরবর্ত্তী পাহাড়ে, রাত্রিকালে শ্রান্ত-পদে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরে আসে নংবার শিবিরে।

পাহাড়ের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায় নংবা থেকেই।

কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে একশো মাইল আর উত্তর থেকে দক্ষিণে একশো মাইল এই বিরাট ভূখণ্ড ব্যেপে পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি অবস্থিত। মনে হয় এ পর্ব্বতমালা অনন্ত। প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে সুনীল শৈলমালা ঝলমল করতে থাকে। মাঝে মাঝে অরণ্যচারী হিংস্র পশুর গর্জ্জনে নিস্তব্ধ গিরি-কন্দর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। কোথাও বিচিত্র লতাগুচ্ছবেষ্টিত বিরাটকায় বনস্পতিসমূহ উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে, কোথাও বা মাইলের পর মাইল বিস্তৃত বেণুবন মৃদু বাতাসে মর্ম্মরায়মাণ। দক্ষিণ দিকে অনন্ত-প্রসারিত পর্ব্বতমালার দৃশ্য গরিমাময়। প্রত্যেকটি পাহাড়ের যেন একটা নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ আছে। বাঁ-দিকে খোপাম উপত্যকাকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে অভ্রভেদী শৃঙ্গরাজি। সারাদিন কোন্ নিপুণ শিল্পী যেন শৈল-চূড়ায় রঙের তুলি বুলাতে থাকে। সূর্য্যোদয়কালে শিখরসমূহ ধারণ করে গোলাপী আভা, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের খরদীপ্তিতে সেগুলোকে দেখায় ঘন সবুজ। আবার সায়ংকালে গিরি-চূড়াসমূহ অস্তসূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে লোহিতাভ-বেগুনী রঙে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। সে মহিমামণ্ডিত দৃশ্য বাস্তবিকই অতুলনীয়। ডানদিকে মরকত-হরিৎ তৃণাচ্ছাদিত গড়ানে ভূখণ্ড চলে গেছে বরাবর নাগা বস্তীর অভ্যন্তরে, তার পেছনে নজরে পড়ে কালো রঙের এক গিরি-শৃঙ্গ। "লাম্পিতে" যে-সমস্ত হুম্পি বা শার্দ্দূল-রাজের দর্শনলাভ মধ্যে মধ্যে ঘটে এই কৃষ্ণ পর্ব্বতই নাকি তাদের আবাসস্থল।

মাঝখানে তিন সারি পাহাড়,—যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে,—একেবারে চক্রবাল পর্য্যন্ত উধাও হয়ে চলে গেছে। ঐ পাহাড়ের মালা কোথাও সবুজ, কোথাও পীতাভ, কোথাও বা বৃক্ষতৃণলতাবিরল শৈলসানুদেশের লাল মাটি দৃশ্যমান। পাহাড়ের কোনো কোনো স্থানে পড়েছে অরণ্যের কৃষ্ণচ্ছায়া—আবার কোথাও বা ঝরণা এবং প্রপাতের জলধারা সূর্য্যালোকে রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্

করছে। সুদূর শৈলমালার মুক্তা-মসৃণ ধূসর-নীল পটে বিচিত্র বর্ণসমূহের কি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!

যতদূর তাকাও, যেদিকে তাকাও খালি পাহাড়ের পর পাহাড়, শিখরের পর শিখর; প্রত্যেকটিই সৌন্দর্য্যে অনুপম। এদের মধ্যে যেন সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা চলছে।

পাহাড় সুন্দর বটে, কিন্তু বড়ই নিষ্ঠুর। আমাদের 'লাম্পি' তৈরি হবার আগে সমতলে নেমে যদি কেউ পীড়িত বা আহত হ'ত তাহ'লে মৃত্যুর কবলে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর ছিল না। কেন-না, অসুস্থ দেহে চড়াই অতিক্রম করে তার পক্ষে নিজ-গৃহে পৌছানো কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে উঠত না। জুন মাসে ব্রহ্মদেশ থেকে পলাতকদের মধ্যে শত শত লোক এমনিভাবে মরেছিল। এই পাচ ছয় হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতমালা পথ রোধ করে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। পর্ব্বত দুর্ব্বলের প্রতি বড় নির্ম্মম।······

আমি জেনারেলকে কথা দিয়েছিলাম যে, ২১শে সেপ্টেম্বর 'জিপ' চালিয়ে জিরিঘাটে গিয়ে পৌছব। কিন্তু তা কি সম্ভব? আশা-নিরাশার দোলায় আমার চিত্ত আন্দোলিত হতে লাগল। না! এ অসম্ভব, যদি না · যদি না কোনো অঘটন ঘটে, কেন-না, হাতে আছে মাত্র আর একটি সপ্তাহ। কিন্তু, কথার খেলাপ ত কিছুতেই হতে পারে না। জিরিঘাট পৌছতে হবে একুশে তারিখেই।

এমনি সময় হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে একদিন জেমস ড্রাইভার ষ্ট্র্যাণ্ডকে নিয়ে এসে হাজির। ষ্ট্র্যাণ্ড ইয়া লম্বা-চওড়া, প্রকাণ্ড জোয়ান। একে ' সে মোটর চালানোয় সুদক্ষ তার ওপর নিতান্ত একগুঁয়ে ও দুঃসাহসী। তার কথাবার্ত্তা শুনে আর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল দুর্গমপথে 'জিপ' যদি তাকে নিয়ে যেতে না পারে, তা হলে তার পক্ষে চাই কি জিপটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

দেখলাম, এই লম্বা-চওড়া মানুষটি শুধু যে লম্বা-চওড়া কথা বলে তা নয়। সে যা বলে কাজেও তাই করে। সবাইকার তাক লাগিয়ে দিয়ে ১৭ই সেপ্টেম্বরের

অপরাহ্ন-কালেই জিপ চালিয়ে সে জিরিঘাটে গিয়ে পৌঁছল। আমাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হ'ল নির্দ্দিষ্ট তারিখের চারদিন পূর্ব্বেই।

হঠাৎ খবর এল 'জেনারেল' ইম্‌ফলের পলিটিক্যাল এজেণ্ট আর দরবারের প্রেসিডেণ্টকে নিয়ে আমাদের শিবিরে আসছেন ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এ খবর যখন নাগাদের নিকট গিয়ে পৌঁছল তখন তাদের মধ্যে সে কি বিস্ময় আর উত্তেজনা! স্বয়ং জেনারেল সাহেব আসছেন! সংসারে এমন আশ্চয্য ঘটনাও কি সম্ভব! বার বার তারা "উ উ, কাট্টি" "উ উ কাট্টি" বলে বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

অবশেষে বাস্তবিকই এ অঘটন ঘটল। জেনারেল সাহেব স্বয়ং সশরীরে, সদলবলে নাগাপুঞ্জী তাইরেনপক্‌পিতে এসে পৌঁছলেন। নাগারা তাকে 'জু' (এক প্রকার ধেনো মদ) দিয়ে অভ্যর্থনা করলে, তাদের খুশী করবার জন্যে তিনি কয়েক ঢোক্ পান করলেন। আর সদ্দারদের সঙ্গে যে সমস্ত 'চাপাং'রা (শিশু) এসেছিল তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে টাকা আর কিছু কিছু নুন দিলেন।

৩৬ মাইলষ্টোনের নিকটস্থ নাগাপুঞ্জীতে যখন জেনারেল সাহেব গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ একটি ছাগ হত্যা করা হ'ল। তিনি সমবেত নাগাদের সম্বোধন করে সাধারণভাবে কিছু বললেন। দোভাষী হেনরি তা নাগা-ভাষায় তর্জ্জমা করে তাদের বুঝিয়ে দিলে। নাগারা কাকে উদ্দেশ করে জেনারেল সাহেব কথাগুলো বললেন তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে তুমুল বচসা বাধিয়ে দিলে। প্রত্যেক নাগা-গৃহিণী কিন্তু, এ বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে ঘরে ফিরলে যে, তার স্বামীর সঙ্গে জেনারেল সাহেবের একেবারে দহরম-মহরম। তাই না তার সঙ্গেই তিনি কথা বললেন, তার কাজে খুশী হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালেন।

নাগাপুঞ্জী থেকে জেনারেল সাহেব সদলবলে খোপাম উপত্যকা পরিদর্শন করতে গেলেন। তাঁদের বিদায় দিয়ে আমি লাগাইরংএ এসে রাত্রি যাপন করলাম। কাজ এখনো ঢের বাকী। জিরিঘাট পর্য্যন্ত 'জিপ' চলাচলের রাস্তা

তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু এটাকে।পরিণত করতে হবে রাজপথে। তারপর জিরিঘাট থেকে লখীপুর পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ এখনো বাকী।* মাত্র নয় দিনের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে হবে।

২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাস্কেলকে সঙ্গে নিয়ে নংবাতে পৌঁছে দেখি, নদীর ওপারে ৫১ মাইলষ্টোনের নিকটে একটি জিপ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। জিপে চড়ে আমরা একটা পাহাড়ের ওপর উঠলাম। সেখান থেকে উৎরাই পথে ৫৯ মাইলষ্টোন্ পর্য্যন্ত যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। ক্রমাবরোহণ করতে করতে দুর্গম রাস্তায় হ'ল আকস্মিক দুর্ঘটনা। জিপখানা গড়িয়ে চলতে লাগল খদের দিকে। বেগতিক দেখে আমরা জিপের ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়লাম। আমি প্রাণপণে রাস্তা আঁকড়ে ধরে গভীর গহ্বরে পতনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করলাম। একটু ধাতস্থ হয়ে সুমুখের পানে তাকিয়ে দেখি, আন্দাজ বিশ ফুট নীচে একটা মস্ত লম্বা বাঁশগাছ ধরে ঝুলছে মাস্কেল আর আমাদের জিপখানা হড় হড় করে নেমে যাচ্ছে খদের গভীর গহ্বরে।

সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরে আর একখানা জিপের আওয়াজ শোনা গেল। বাঃ! এ যে ড্রাইভার রবার্টস! সে চলেছে লাগাইরংএর পথে। তার জিপে করে আমরা পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে নংবাতে ফিরে এলাম।···

আর একটি সপ্তাহ মাত্র বাকী। কিন্তু কাজ শেষ করবার জন্যে যে বহুসংখ্যক কুলীর প্রয়োজন। এখন কুলী যোগাড় হয় কোথা থেকে? দোভাষীরা ছুটল চারদিকে। নাগা আর কুকিরা যখন শুনলে যে, মাত্র আর এক সপ্তাহের মধ্যে 'লাম্পি'র কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন দলে দলে এসে তারা কাজে যোগ দিলে।

কুকিরা সব আসতে লাগল দক্ষিণ দিক থেকে। মূর্খ বলে নাগাদের এরা অবজ্ঞার চোখে দেখে। অনেক কুকিই ইংরাজী ভাষায় কথা বলতে পারে। আমাদের দোভাষীরা বেশীর ভাগই ছিল কুকি। 'আসাম রাইফেল্স'-এর

* শিলচর লখীপুরের পশ্চিম দিকে পনের মাইল দূরে অবস্থিত। শিলচর থেকে লখীপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে বহুকাল ধরেই মোটর চলাচল করে।

বেশীর-ভাগই কুকি সৈন্য। গত মহাযুদ্ধের সময় বহু কুকি ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে গিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।······

আজ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে আজ সুনির্ম্মল প্রসন্নতা। এখনো চৌদ্দ মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ বাকী। হাতে আছে আর মাত্র তিনটি দিন। ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আমাদের সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। এখন আর কোনো কথা নয়। শুধু কাজ, কাজ, কাজ! আমাদের সৈন্যেরা আর নাগা-কুকিরা সবাই মরীয়া হয়ে কাজ করতে লাগল।

২৮শে সেপ্টেম্বর—আজকের দিনটি আরো সুন্দর। আকাশ নির্মেঘ, স্বচ্ছ, সুনীল। রাত্রে নীচেকার উপত্যকায় অবিশ্রান্ত তুষারপাত হতে লাগল। লাগাইরং-এর রেষ্ট হাউসে শুয়ে শুয়ে সুরু হ'ল আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু খোপাম উপত্যকার সঙ্গে নীরব ভাষায় ভাব-বিনিময়। রাত্রি দশটা নাগাদ শ্যামসুন্দর উপত্যকার প্রায় সমস্তটাই শুভ্র তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাথার ওপরকার আকাশে সঞ্চরমান শুক্লপক্ষের চাঁদ দিগন্তব্যাপী তরল শুভ্রতার ওপর অজস্রধারায় শুভ্র কিরণধারা ঢেলে দিতে লাগল। রাত্রির সৌন্দর্য্য আমার সকল শ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়ে দিলে। চন্দ্রকরবিধৌত, তুষারাবৃত, বিরাট উপত্যকাভূমি যেন একখানা অনন্ত-প্রসারিত রূপার পাতের মত চক্চক্ করছে। মনে হল জ্যোৎস্নালোকিত, মহাশ্মশানের মত নিস্তব্ধ উপত্যকাভূমি যেন কি এক গভীর রহস্যে সমাচ্ছন্ন।

২৯শে সেপ্টেম্বর—সাতটার সময় ঘুম থেকে ওঠে দেখি সূর্য্য উঠেছে। আকাশ নীল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, বৃষ্টির কোনো লক্ষণই নেই। মনের আনন্দে আমি গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইতে লাগলাম। বৃষ্টিতে আমাদের কাজ ব্যাহত হওয়ার কোনো আশঙ্কাই আর নেই। বাকী আছে আর মাত্র ছয় মাইল।

আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর। এখন বসে আছি নংবার রেষ্ট হাউসে। রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের একদল লোককে মোটরে বিষেণপুর থেকে ১০৯ মাইল দূরবর্ত্তী শিলচরে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ইচ্ছা করলে পরদিনই তারা কলকাতায় গিয়ে পৌছতে পারে।···

কাল আমাদের তৈরি রাস্তা পরিদর্শন করবার জন্যে আমি একবার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হব। চাইকি শিলচর পর্য্যন্ত গিয়েও একটা রাত কাটিয়ে আসতে পারি। বিগত এগারোটি সপ্তাহ যাবৎ তীর্থযাত্রীর আগ্রহ নিয়ে পথ নির্ম্মাণ করতে করতে ধীরে ধীরে আমরা শিলচরের দিকে এগিয়ে আসছি। এই দীর্ঘ তিনমাস আমাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল বিষেণপুর থেকে পার্ব্বত্য পথে শিলচরে পৌঁছা।···

পাহাড়ের অত্যুন্নত অধিত্যকার ওপর অবস্থিত নংবা। বহু নিম্নে বয়ে চলেছে মৎস্যরাজিতে পরিপূর্ণ ইরাং নদী।

ভাবছি যে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সৈন্যেরা সবাই যখন বাড়ী চলে যাবে তখন লাগাইরংএ পুরো একটি দিন এবং এক রাত্রি কাটিয়ে যাব। উপত্যকাটিকে আরএকবার ভাল করে দেখবার সময় এবং সুযোগ আমাকে করে নিতে হবেই। একবার এখান থেকে চলে গেলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর তো এর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হবে না। সুতরাং এর পরিপূর্ণ স্মৃতিটুকুই আমি অন্তরে বহন করে নিয়ে যেতে চাই।

বিদায়, উপত্যকা! তুমিই আমার অন্তরে জাগিয়েছিলে পথ নির্ম্মাণের প্রেরণা! আমার ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। তোমার কাছে হার মেনে ক্ষুব্ধচিত্তে কতবার তোমার কাছ থেকে আমি চলে গিয়েছি। কিন্তু আবার ছুটে এসেছি আকুল আগ্রহে তোমার ভীম-কান্ত সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে।

বিদায় বন্ধু! যত শীঘ্র সম্ভব আবার তোমার কাছে আমি ফিরে আসব।

বিদায় খোপাম উপত্যকা।

পরিশিষ্ট

মণিপুরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

(১৭১৪—১৮৮৬)

মণিপুরের আধুনিক ইতিহাসের আরম্ভ ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে আদিবাসী রাজা পানহেইবার সিংহাসনারোহণের সঙ্গে। রাজা হবার পর তিনি 'গরীব নেওয়াজ' এই ফার্সী উপাধি ধারণ করেন, তাঁর রাজত্বকাল ১৭১৫—১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গরীব নেওয়াজের পৌত্র জয়সিংহ ওরফে ভাগ্যচন্দ্র সিংহ মণিপুরের রাজা হন; তাঁরই আমন্ত্রণে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভেরেলষ্ট সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক কর্ম্মচারী ইত্যাদি সহ মণিপুরে গমন করেছিলেন। ভাগ্যচন্দ্র ৩৪ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যচন্দ্রের পুত্র মারজিৎ ব্রহ্মরাজার সাহায্যে মণিপুর দখল করেন কিন্তু ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্যের আক্রমণে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহ ব্রহ্মের সৈন্যদলের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৮২৪ সালে তিনি ইংরাজসেনার সাহায্যে বর্ম্মীদের মণিপুর থেকে বিতাড়িত করেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর একমাত্র পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তির বয়স একবৎসর মাত্র। গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি নরসিংহ বালক-রাজার অভিভাবকস্বরূপ রাজ্যশাসন করতে থাকেন। বৎসরখানেকের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরে ব্রিটিশ রেসিডেন্সী স্থাপন করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহকে হত্যা করবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হয়, চন্দ্রকীর্ত্তির মাতাও তাতে যোগদান করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহের পরলোক-গমনের পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু ১৯ বৎসরের যুবক চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁকে পরাস্ত করে সিংহাসন দখল করেন; তাঁর রাজত্বকাল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তার পরবর্ত্তী শূরচন্দ্র কুলচন্দ্র যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ ও চূড়াচাঁদের (১৯০৭-১৯৪১) কাহিনী গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

(ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত)।